POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ؕ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ

এবং তোমার জাতি ইহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে,অথচ ইহাই সত্য; তুমি বল,' আমি তোমাদের উপর কোন অভিভাবক নহি।'

(আল আনআম: ৬৭)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 7

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 29

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 21 শে জুলাই, 2022 21 জুল হজ্জ 1443 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

অনুমতি না পেলে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ।

২০৬২) উবায়েদ বিন উমায়ে এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলে তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয় নি। হয়তো (হযরত উমর) কাজে ব্যস্ত ছিলেন। হযরত আবু মুসা ফিরে যান। এর মধ্যে হযরত উমরের কাজ শেষ হলে তিনি বললেন, 'আমি কি আব্দুল্লাহ বিন কায়েস (আবু মুসা)-র কণ্ঠ শুনেছিলাম? তাঁকে ভিতরে আসার অনুমতি দাও। তাঁকে বলা হল তিনি তো ফিরে গেছেন।অতঃপর হযরত উমর (রা.) তাঁকে ডেকে পাঠান (এবং জিজ্ঞাসা করেন) তখন (হযরত আবু মুসা) বললেন, আমাদেরকে এই আদেশই দেওয়া ছিল (যখন অনুমতি না পাবে, তখন ফিরে যাবে)। তখন হযরত উমর (রা.) বললেন, আপনাকে এ বিষয়ের সাক্ষী জোগাড় করতে হবে।'এরপর তিনি আনসারদের মজলিসে গিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল- এ বিষয়ে কেউ আপনার জন্য সাক্ষী দিবে না, কিন্তু সেই ব্যক্তি যে আমাদের মধ্যে সব থেকে স্বল্প বয়স্ক। অর্থাৎ আবু সাঈদ খুদরী (রা.)। তখন তিনি আবু সাঈদ খুদরী (রা.)কে সঙ্গে করে নিয়ে যান। (তাঁর কথা শুনে) হযরত উমর বললেন: রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর এই নির্দেশটি কি আমার অগোচরে থেকে গিয়েছিল? বাজারের কেনাবেচা আমাকে উদাসীন করে রেখেছিল। এর দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে ব্যবসা বাণিয্য সূত্রে তিনি বাইরে যেতেন।

(সহী বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল বুইয়ু)

জুমআর খুতবা, ১০ ই জুন ও ১৭ ই

জ ,

মুত্তাকীদের জন্য বড় বড় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীদের অভিভাবক হয়ে থাকেন, এর থেকে বড় প্রাপ্তি আর কি হতে পারে?

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

এখন এরপর পুনরায় আমি আসল বিষয়ের দিকে আসছি। মুত্তাকি কারা? বস্তুত, মুত্তাকীদের জন্য বড় বড় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীদের অভিভাবক হয়ে থাকেন, এর থেকে বড় প্রাপ্তি আর কি হতে পারে? সেই সব মানুষা মিথ্যাবাদী যারা বলে, যে তারা খোদার নৈকট্যভাজন, অথচ তারা মুত্তাকী নয়, বরং পাপাচার ও ব্যাভিচারপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করছে। এই ভাবে তারা অন্যায় করছে,যখন খোদার নৈকট্যভাজন ও ওলী হওয়ার দাবি করে, কেননা আল্লাহ্ তা'লা এর সঙ্গে মুত্তাকী হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন।

অতঃপর আরও একটি শর্ত আরোপ করেছেন বা ভিন্নভাক্যে মুত্তাকিদের একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا খোদা তাদের সঙ্গে থাকেন।। অর্থাৎ খোদা তাদের সাহায্য করেন যারা মুত্তাকী হয়ে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লার সান্নিধ্য লাভের প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর পক্ষ থেকে সাহায্য প্রাপ্তির দ্বারা। লোকেরা যেহেতু আর মুত্তাকি নেই, তাই ওলীর মর্যাদার প্রথম দরজাটি এমনিতেই বন্ধ হয়ে আছে। এখন খোদার সহচার্য এবং সমর্থনের দরজাটি তাদের নিকট বন্ধ হল। সব সময় স্মরণ রাখবেন, অপবিত্র এবং দুরাচারীরা কখনও খোদার সাহায্য লাভ করতে পারে না। ঐশী সাহায্য তাকওয়ার উপর নির্ভরশীল। মুত্তাকিদের জন্যই খোদার সাহায্য নির্ধারিত।

এছাড়া আরও একটি দৃষ্টিকোণ রয়েছে। মানুষ বিভিন্ন সমস্যাবলী ও বিপদাবলীর সম্মুখীন হয়, তার বিবিধ চাহিদাবলী রয়েছে। আর সেই সব সমস্যার সমাধান হওয়া এবং চাহিদাবলী পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে তাকওয়াই হল প্রাথমিক উপকরণ। আর্থিক অস্বচ্ছলতা এবং অন্যান্য অভাব-অনটন থেকেই একমাত্র তাকওয়াই মুক্তি দিতে পারে। (وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ এবং তিনি তাহাকে এমন দিক হইতে রিযক দিবেন যাহা সে কল্পনাও করিতে পারে না।) (আততালাক: ৩,৪) আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকির জন্য প্রত্যেক জটিলতার সময় পরিত্রাণের পথ বের করে দেন এবং অদৃশ্য থেকে এর থেকে বের হওয়ার উপকরণ সৃষ্টি করে দেন। তাকে এমনভাবে রিযক দান করেন যেখান থেকে সে মোটেই প্রত্যাশা করে না।

(মালফুযাত,১ম খণ্ড, পৃ: ৩৭৯)

নবুয়ত ছাড়া কখনও পৃথিবী নিজের অধিকারসমূহ রক্ষা করতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না পৃথিবীবাসী এই নেয়ামত বারংবার লাভ করে, মানুষ উন্নতি পথে অগ্রসর হতে পারে না।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা নহল এর ৭২ নং আয়াত

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَآدِّىْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ ؕ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ

এর ব্যাখ্যায় বলেন: যারা দেশ ও শাসনক্ষমতার শীর্ষে আসীন হয় তাদের মূল অজুহাত এটাই থাকে যে, জাগতিক ব্যবস্থাপনা যোগ্য ব্যক্তির হাতে থাকা বাঞ্ছনীয়। আর তারা কতিপয় পরিবারকে এই যোগ্যতার জন্য বেছে নেয় আর এভাবে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছু পরিবারকে রাজত্ব করার যোগ্য বলে বিবেচনা করা হয় আর সাধারণ মানুষের কোনও মতামত নেওয়া হয় না কিম্বা শাসনব্যবস্থায় তাদের কোনও দখলও থাকে না। এছাড়া মানুষের কিছু অধিকার ধর্মীয় নেতা, পীর ও গণকেরা ছিনিয়ে নেয়। ধর্মকে পণ্ডিত, মৌলবী এবং পাদ্রীদের সম্পত্তি বলে মনে করা হয়। সাধারণ মানুষকে ধর্ম সম্পর্কে অবগত করা হয় না, কিম্বা তাদের মাঝে এ নিয়ে কৌতুহল তৈরীর সুযোগও দেওয়া হয় না। কেবল ধরে নেওয়া হয় যে, সাধারণ মানুষের কাজ কেবল ধর্মীয় নেতাদের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করা। ধর্মীয় গ্রন্থাবলী নিজেরাই প্রণিধান করা এবং তা থেকে উপকৃত হওয়া তাদের কাজ নয়।

এরপর ২ পাতায়...

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

বস্তুত, নবুয়্যতের যুগ থেকে যখন কোনও জাতি দূরে চলে যায় তখন সেই জাতির অধিকারসমূহ মুষ্টিমেয় পরিবারের উত্তরাধিকার হিসেবে কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। আর জনসাধারণকে জাগতিক কিম্বা ধর্মীয় কোনও বিষয়েই পরামর্শ দেওয়ার যোগ্য মনে করা হয় না। আর এই পার্থক্যটিকে এক মিথ্যা যোগ্যতার পরিণাম বলে ধরা হয়। এক বাদশহার আহম্মক সন্তানকে পৃথিবীর সব থেকে বুদ্ধিমান মানুষ বলে গণ্য করা হয়। আর সেই নির্বোধ নিজে এতটাই গর্বিত থাকে যে, যখন সে পৃথিবীর সামনে নিজের কোনও নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ ঘোষণা করে তখন সেই ঘোষণার মধ্যে বিভিন্ন অসংলগ্ন শব্দ ব্যবহার করে।

অনুরূপ অবস্থা ধর্মীয় জগতেরও। উলোমাদের পুত্ররা অর্ধেক জ্ঞান রাখে আর নিজেদের ভাবনাশক্তি থেকে বঞ্চিত থাকে। কিন্তু তাদেরকে মাশায়েখ এইজন্য বলা হয় যে তারা উলেমাদের সন্তান। আর তারা চায় লোকে তাদেরকে বিনা প্রশ্নে তাদের অজ্ঞতাপূর্ণ কথাবার্তা মেনে নিক। আর যে তাদের সামনে খোদা তা'লার বাণী উপস্থাপন করে তাকে সেই সব অবাস্তব কল্পকাহিনী এবং অর্থহীন বর্ণনা, যেগুলির কোনও প্রমাণ তাদের কাছে থাকে না, অস্বীকারকার করার দরুণ তারা তাকে কাফের ও মুরতাদ আখ্যায়িত করে বসে।

এমন সময়ে কেবল নবীই কাজে আসতে পারে আর এই সব ব্যধির চিকিৎসা করতে পারে। যখন তারা আবির্ভূত হন, তখন নিজেদেরকে জ্ঞানী ভেবে বসা অজ্ঞরা নবীদেরকে সনাক্ত করা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। আর সেই সব জ্ঞানী যারা মুর্খ নামে পরিচিত ছিল, নিজেদের অন্তর্দৃষ্টি এবং পবিত্র মননের সাহায্যে নবীর উপর ঈমান আনে। তখন ফিরিশতা এবং শয়তানের লড়াই শুরু হয়। আর যাদেরকে অযোগ্য মনে করা হয়েছিল, যোগ্যতার নামে মানবজাতিকে যারা দাস বানিয়ে রেখেছিল তাদের প্রতিটি পরিকল্পনাকে এমনভাবে থেঁতলে দেয় যেভাবে চিল মৃতপশুর দেহ থেকে মাংস নিয়ে পাথরের উপর আঘাত করে। আর এভাবে এই সব স্বঘোষিত যোগ্য ব্যক্তিদের যোগ্যতার মুখোশ খুলে পড়ে এবং দীর্ঘকাল যাবৎ অবদমিত জনসাধারণ পুনরায় মাথা তুলে দাঁড়াবার সুযোগ পায়, মানবতা পুনরায় স্বাধীনতার স্বাদ নেয়। এই আয়াতে এ বিষয়টিকেই বর্ণনা করা হয়েছে। এবং বলা হয়েছে যে, খোদা তা'লার নেয়ামত যাদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে, তারা যাদেরকে দাস বানিয়ে ফেলে তাদেরকে কখনোই নিজেদের বরাবরের অংশীদার করে না। এমন লোকেরা কি কখনও সাধারণ মানুষকে নিজেদের স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে দিয়েছে কিম্বা স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিয়েছে? যদি না দিয়ে থাকে, তবে নবীরা ছাড়া, যারা সময়ে সময়ে আবির্ভূত হয়ে পৃথিবীকে স্বাধীনতা দিয়েছে, মানুষের উন্নতির জন্য আর কোনও উপায় অবশিষ্ট রয়েছে? এই যুক্তিটিতে নবুয়্যতের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করা হয়েছে। আর এটি এমন এক শক্তিশালী প্রমাণ যা প্রত্যেক অন্তর্দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি দেখার পর একথা বলতে বাধ্য হবে যে, নবুয়ত ছাড়া কখনও পৃথিবী নিজের অধিকারসমূহ রক্ষা করতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না পৃথিবীবাসী এই নেয়ামত বারংবার লাভ করে, মানুষ উন্নতি পথে অগ্রসর হতে পারে না।

'আফাবিনিয়ামাতিল্লাহি ইয়াজহাদুন' আয়াতে সাধারণ মানুষের প্রতি ভর্ৎসনা করা হয়েছে যে, তোমাদের স্বাধীনতার জন্য এই রসুল এসেছেন আর তোমরা এই নেয়ামতকে অবজ্ঞা করে সেই সব অত্যাচারীদের সঙ্গে মিলে কাজ করছ যারা অবৈধভাবে তোমাদের অধিকার আত্মসাৎ করে বসে আছে।

(তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৯৮)

اِحْفَظْ لِسَانَكَ

[তোমরা নিজেদের জিহ্বাকে সংযত (রক্ষা কর) রাখ]
মিথ্যারোপ, মিথ্যা, পরচর্চা, পর-নিন্দা, ঝগড়া, কলহের বিষয় থেকে এবং অশ্লীল কথাবার্তা থেকে বিরত থাক।

-হাদীস

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

প্রবেশিকা পরীক্ষা

জামেয়া আহমদীয়া কাদিয়ান

জামিয়া আহমদীয়া কাদিয়ান হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দ্বারা স্থাপিত সেই পবিত্র প্রতিষ্ঠান যেখান থেকে এ যাবৎ শত-সহস্র উলেমা, মুবাল্লিগীন বের হয়ে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার গুরু দায়িত্ব পালন করছেন। সৈয়্যেদানা হুযুর আনোর (আই.) অনেক স্থানে আহমদী ছাত্রদেরকে মসীহ মওউদ (আ.) দ্বারা স্থাপিত এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষা অর্জন করে জামাতের সেবা করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অতএব হুযুর আনোয়ারের নির্দেশের আলোকে সমধিক হারে ওয়াকফীনে নও এবং গায়ের ওয়াকফীনে নও ছাত্রদেরকে জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হয়ে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে জামাতের সেবার জন্য আত্মোৎসর্গ করা উচিত।

জামিয়ার জন্য ২০২২-২০২৩ শিক্ষা বৎসর এপ্রিল, ২০২২ থেকে আরম্ভ হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রদের ভর্তি প্রক্রিয়া অনলাইনে হচ্ছে।

অতএব, যথাশীঘ্র ওয়াকফে নও ভারত (নাযারত তালিম) অফিস থেকে ভর্তির ফর্ম চেয়ে তা পূর্ণ করে ওয়াকফে নও অফিসে পাঠিয়ে দিন। ভর্তির ফর্ম চেয়ে পাঠানোর ই-মেল ঠিকানা - waqfenau@qadian.in

In-Charge Waqf-e-Nau Department
Office Waqfe-Nau India (Nazarat Taleem)
M.T.A Building, Civil Line, Qadian
District: Gurdaspur, Punjab (India) Pin: 143516
(নাযির তালিম ও সদর ন্যাশনাল ক্যারিয়ার প্ল্যানিং কমিটি ওয়াকফে নও ভারত)

কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুস সানাআত-এ ভর্তি।

দারুস সানাত কাদিয়ানে নতুন বছর ২০২২-২০২৩-এর জন্য ভর্তি শুরু হয়েছে। ভর্তির পর নতুন সেশন-এর ক্লাস জুলাই মাস থেকে শুরু হবে। ইচ্ছুক যুবকরা যোগাযোগ করুন। দারুস সানাত প্রতিষ্ঠানটি NSIC দিল্লি নথিভুক্ত যার অধীন নিম্নোক্ত কোর্স করানো হচ্ছে।

Course	Fee	Duration
Certificate in computer applications	9000	1 Year
plumbing	6000	1 Year
Electrician	6000	1 Year
Welding	6000	1 Year
Diesel Mechanic	10000	1 Year
Motor Vechicle Mechanic	7000	1 Year
AC & Refrigerator	9000	1 Year

নোট: ফি-র টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করা যেতে পারে। ফি-র টাকা NSIC বোর্ডে যায়। কাদিয়ানের বাইরের আহমদী যুবকদের জন্য হোস্টেল এবং খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। যার জন্য কোনও অর্থ নেওয়া হয় না। বোর্ডের ফি ছাড়া অন্য কোনও ফি নেওয়া হয় না।

বিশদে জানতে নিচের নম্বরে ফোন করুন।
৯৮৭২৭২৫৮৯৫, ৮০৭৭৫৪৬১৯৮
(অধ্যাপক, দারুস সানাআত)

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০টা পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কোন জিনিসে যত নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেই বস্তুর জন্য তত বেশি সৌন্দর্যের কারণ হয় আর যেটি থেকে কোমলতা ও নম্রতা হারিয়ে যায়, সেটি ততটাই কুৎসিত হয়ে পড়ে।" (সহী মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

জুমআর খুতবা

হযরত আবু বাকার (রা.) বললেন: হে আবু খায়সামা! কি সংবাদ এনেছ? তিনি নিবেদন করলেন: হে রসুলের খলীফা! শুভ সংবাদ। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ইয়ামামার উপর বিজয় দান করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন: হযরত আবু বাকার (রা.) সিজদা করলেন।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহান মর্যাদাবান সাহাবী এবং খলীফায়ে রাশেদ হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-এর জীবানালেখ্য।

ইয়ামামার যুদ্ধের দুটি ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা

মুসায়লামা কাযযাব-এর হত্যার ঘটনা।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত** ১০ জুন , ২০২২, **এর জুমুআর খুতবা (১০ এহসান, ১৪০১ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর স্মৃতিচারণে ইয়ামামার যুদ্ধের আলোচনা হচ্ছিল। এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি আব্বাদ বিন বিশ্রকে বলতে শুনেছি, হে আবু সাঈদ! আমাদের বাযাখার অভিযানসম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পরবর্তী রাতে আমি স্বপ্নে দেখি, যেন আকাশ উন্মুক্ত করা হয়েছে আর এরপর তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হলো, শাহাদত বরণ করা। আবু সাঈদ (রা.) বলেন, আমি তাকে বলি ইনশাআল্লাহ্ যাই হবে ভালো হবে। তিনি বলেন, ইয়ামামার দিন আমি তাকে দেখছিলাম, তিনি আনসারদের ডেকে বলছিলেন, 'আমার দিকে আস'। এই আহ্বানে তাদের চারশত লোক ফিরে এসেছিল। বারা' বিন মালেক, আবু দুজানা এবং আব্বাদ বিন বিশ্র তাদের সম্মুখে ছিলেন। এক পর্যায়ে তারা সবাই বাগানের দরজার কাছে পৌঁছে যায়। আমি আব্বাদ বিন বিশ্রের শাহাদতের পর তাকে দেখেছি, তার চেহারায় তরবারির বহু আঘাতের চিহ্ন ছিল। আমি তাকে তার দেহের কোন একটি চিহ্ন দেখে সনাক্ত করতে পেরেছি।

এরপর হযরত উম্মে আম্মারার উল্লেখ পাওয়া যায়। উম্মে আম্মারা ইসলামের ইতিহাসে খুবই বীর একজন মহিলা সাহাবী ছিলেন। তার নাম ছিল নুসায়বা বিনতে কা'ব। তিনি ওহুদের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন এবং পরম বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। মুসলমানরা যতক্ষণ বিজয়ীর আসনে ছিল ততক্ষণ তিনি মশকে পানি ভরে ভরে লোকদেরকে পান করাচ্ছিলেন। কিন্তু যখন পরাজয়ের মুহূর্ত আসে তখন মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে যান এবং বীরত্বের সাথে দাঁড়িয়ে যান। কাফেররা যখনই মহানবী (সা.)-এর দিকে অগ্রসর হতো তখন তিনি তির ও তরবারি দিয়ে তাদের প্রতিহত করতেন। পরবতীতে মহানবী (সা.) নিজে বলেছেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন আমি তাকে আমার ডানে ও বামে সমানভাবে যুদ্ধ করতে দেখেছি। ইবনে কামিয়া যখন মহানবী (সা.)-এর নিকটে পেঁ ছায় তখন উম্মে আম্মারা অগ্রসর হয়ে তাকে প্রতিহত করেন। এমনকি তার আক্রমণে হযরত উম্মে আম্মারার কাঁধে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়। তিনিও তরবারি চালান কিন্তু সে বর্মের ওপর বর্ম পরে রেখেছিল বলে তার তরবারির এই আঘাত কার্যকর হয় নি। যাহোক এই উম্মে আম্মারা (রা.) -এর একটি ঐতিহাসিক মর্যাদা রয়েছে। তিনি (রা.) বলেন, তার ছেলে আব্দুল্লাহ্ মুসায়লামা কায্যাবকে হত্যা করেছেন। হযরত উম্মে আম্মারা সেদিন নিজেও ইয়ামামার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন আর এযুদ্ধে তার এক বাহু কেটে গিয়েছিল। উক্ত যুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণের যে কারণ বর্ণিত হয়েছে তা হলো, মহানবী (সা.) যখন ইন্তেকাল করেন তখন তার ছেলে হাবীব বিন যায়েদ আমর বিন আসের সাথে ওমানে ছিল। আমর (রা.)-এর কাছে যখন মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি ওমান থেকে ফিরে আসেন আর পথিমধ্যে মুসায়লামার মুখোমুখি হন। হযরত আমর বিন আস (রা.) সফর করে এগিয়ে যান। হাবীব বিন যায়েদ এবং আব্দু ল্লাহ্ বিন ওহাব পেছনে ছিলেন তাদের দুজনকে মুসায়লামা ধরে ফেলে এবং বলে, তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রসূল? আব্দুল্লাহ্ বিন ওহাব বলে, হ্যাঁ। মুসায়লামা তাকে লোহার শিকলে বেঁধে রাখার নির্দেশ দেয়। সে তার কথা বিশ্বাস করে নি। সে ভেবেছে হয়তো প্রাণ রক্ষার জন্য এমনটি বলছে। যাহোক মুসায়লামা কায্যাব যখন হাবীব বিন যায়েদ (রা.)কে বলে, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রসূল? তিনি উত্তরে বলেন, আমি কানে শুনি না। সে পুনরায় বলে, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল? তিনি বলেন, হ্যাঁ। মুসায়লামা তাঁকে শাস্তি দেয়ার নির্দেশ দেয়, ফলে তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়।যখনই সে তাঁকে জিজ্ঞেস করতো, তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আমি আল্লাহর রসূল? তিনি বলতেন, আমি শুনতে পাই না আর যখন সে একথা বলতো, তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহর রসূল? উত্তরে তিনি বলতেন, হ্যাঁ। এভাবে প্রতিবারই সে তাঁর একটি অঙ্গ কেঁটে ফেলতো। কাঁধ থেকে তাঁর হাত বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয় এবং তাঁর পা হাঁটুর উপর পর্যন্ত কেটে ফেলা হয় আর এরপর তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়। এ সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হবার সময় তিনিও তাঁর কথা হতে পিছু হটেন নি আর মুসায়লামা কায্যাবও তার কথা হতে পিছপা হয় নি, এমনকি তিনি আগুনে পুড়ে শাহাদত বরণ করেন।

অপর একটি রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত হাবীব (রা.) যখন মুসায়লামার নিকট পত্র নিয়ে যান তখন সে হযরত হাবীব (রা.)কে এক একটি অঙ্গ কেঁটে শহীদ করে আর এরপর আগুনে পুড়িয়ে ফেলে। হযরত উম্মে আম্মারা যখন তাঁর ছেলের মৃত্যুসংবাদ পান তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করেন , তিনি স্বয়ং মুসায়লামার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন, হয় তাকে হত্যা করবেন নয়তো নিজেই আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হয়ে যাবেন।

ইয়ামামার যুদ্ধের জন্য হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) যখন সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করছিলেন তখন উম্মে আম্মারা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) -এর নিকট উপস্থিত হন এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আপনার মত নারীর জন্য যুদ্ধে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোন জিনিসই বাদ সাধতে পারে না। আল্লাহ্র নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ু ন। এই যুদ্ধে তাঁর আরেক ছেলে আব্দুল্লাহ্ও অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, আমরা ইয়ামামায় পৌঁছার পর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। আনসাররা সাহায্যের জন্য আহ্বান জানায় এবং মুসলমানরা সাহায্যের জন্য পৌঁছে যায়। আমরা বাগানের সামনে পৌঁছালে বাগানের দরজায় ভিড় লেগে যায়। আমাদের শত্রুরা বাগানের এক প্রান্তে অবস্থান করছিল এবং সেই প্রান্তে অবস্থান করছিল যেখানে মুসায়লামা ছিল। আমরা জোরপূর্বক সেখানে (বা বাগানে) প্রবেশ করি এবং তাদের সাথে আমরা কিছু সময় যুদ্ধ করি। আল্লাহ্র কসম! তাদের তুলনায় অন্য কাউকেই আমি আত্মরক্ষার এমন দৃঢ় ব্যবস্থা নিতে দেখি নি। কিন্তু আমি খোদার শত্রু মুসায়লামাকে আমি খুঁজে বের করার ও দেখার সংকল্প করি। আমি আল্লাহ্র সাথে এই অঙ্গীকার করেছিলাম যে, তাকে দেখতে পেলে আমি তাকে ছাড়বো না, হয় তাকে হত্যা করব নতুবা নিজেই শহীদ হয়ে যাব। লোকেরা পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তাদের তরবারিগুলো একটি অন্যটির সাথে এরূপ সংঘর্ষে লিপ্ত হয় যার কারণে কান বধির হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় আর তাদের তরবারির আঘাতের শব্দ ব্যতীত অন্য কোন শব্দই শোনা যাচ্ছিল না। অবশেষে আমি আল্লাহ্র শত্রুকে দেখতে পাই। আমি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। এক ব্যক্তি

আমার সামনে আসে, সে আমার হাতে আঘাত করে এবং তা কেঁটে ফেলে। আল্লাহ্‌র কসম! আমি সেই নোংরা ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছার সংকল্পে দোদুল্যমান হই নি। মুসায়লামা মাটিতে পড়ে ছিল আর আমি আমার ছেলে আব্দুল্লাহ্‌কে সেখানে দেখতে পাই। সে তাকে হত্যা করেছিল। একটি রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উম্মে আম্মারা বর্ণনা করেন, আমার ছেলে তার কাপড় দিয়ে তার তরবারি পরিষ্কার করছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, তুমি কি মুসায়লামাকে হত্যা করেছ? সে বলে, হ্যাঁ, হে আমার মা! হযরত উম্মে আম্মারা বলেন, আমি আল্লাহ্‌র সমীপে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে সিজদা করি। আল্লাহ্ তা'লা শত্রুদের মূলোৎপাটন করেছেন। যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর আমি যখন আমার বাড়ি ফিরে আসি তখন হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) একজন আরব চিকিৎসক নিয়ে আমার কাছে আসেন। তিনি ফুটন্ত তেল দিয়ে আমার চিকিৎসা করেন। আল্লাহ্‌র কসম! এই চিকিৎসা আমার নিকট আমার হাত কাটা চেয়েও অধিক কষ্টকর ছিল। হযরত খালেদ (রা.) আমার অনেক খেয়াল রাখতেন এবং আমাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতেন। আমাদের অধিকারের কথা সর্বদা স্মরণ রাখতেন এবং আমাদের সম্পর্কে নবী করীম (সা.)-এর তাকীদপূর্ণ নির্দেশাবলী স্মরণ রাখতেন। আব্বাদ বলেন, আমি জিজ্ঞেস করি, হে আমার দাদী! ইয়ামামার যুদ্ধে আহত মুসলমানের সংখ্যা (কি) অনেক বেশি ছিল? তিনি বলেন, হ্যাঁ! হে আমার বাছা। আল্লাহ্‌র শত্রু নিহত হয়েছে আর মুসলমানদের সবাই আহত ছিল। আমি আমার দুই ভাইকে এরূপ আহত অবস্থায় দেখতে পাই যে, তাদের মধ্যে প্রাণের কোন স্পন্দনও অবশিষ্ট ছিল না। লোকেরা ১৫ দিন পর্যন্ত ইয়ামামাতে অবস্থান করেছিল। যুদ্ধ সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং আহত হবার কারণে আনসার ও মুহাজেরদের মধ্যে থেকে খুব স্বল্পসংখ্যক লোক হযরত খালেদ (রা.)-এর সাথে নামায পড়ত। তিনি বলেন, আমি জানি, বনু তাঈয়ের কঠিন পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল। আমি সেদিন আদী বিন হাতেমকে উচ্চৈঃস্বরে বলতে শুনেছি, ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর, আমার পিতামাতা তোমাদের জন্য উৎসর্গিত। এছাড়া আমার পুত্র যায়েদ সেদিন অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে।

এক রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উম্মে আম্মারা ইয়ামামার যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন। তরবারি ও বর্শার এগারোটি আঘাত তার গায়ে লেগেছিল। এছাড়া তার একটি হাতও কাটা পড়েছিল। হযরত আবু বকর তার খোঁজখবর নেয়ার জন্য আসতেন। কা'ব বিন উজরা সেদিন প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করেন। সেদিন মুসলমানদের কঠিন পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হয় আর তারা পরাজিত হয়ে পিছু হটতে হটতে সেনাবাহিনীর শেষ অংশকেও ছাড়িয়ে যায়। কা'ব চিৎকার করে বলেন, হে আনসার, হে আনসার! আল্লাহ্ ও রসূলের সাহায্যার্থে এগিয়ে আস! আর একথা বলতে বলতে তিনি মুহাক্কেম বিন তুফায়েল পর্যন্ত পৌঁছে যান। মুহাক্কেম তাকে আঘাত করে এবং তার বাহাত কেটে ফেলে। আল্লাহ্‌র শপথ! কা'ব তবুও দোদুল্যমান হন নি, বরং বাম হাত দিয়ে রক্ত ঝরা অবস্থাতেই ডান হাত দিয়ে পাল্টা আঘাত করতে থাকেন। অবশেষে তিনি বাগানে পৌঁছেন এবং তাতে প্রবেশ করেন। হাজেব বিন যায়েদ অওস গোত্রকে ডেকে বলেন, হে আশআ'ল! তখন সাবেত বলেন, 'তুমি হে আনসার বলে ডাক, তারা আমাদের এবং তোমাদের উভয়েরই বাহিনী। তখন তিনি ডাকতে থাকেন যে, হে আনসার, হে আনসার! এরই মাঝে বনু হানীফা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। লোকজন ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তিনি দু'জন শত্রুকে হত্যা করে নিজেও শাহাদত বরণ করেন। এরপর তার স্থান গ্রহণ করেন উমায়ের বিন অরস। তার ওপরও শত্রুরা আক্রমণ করে বসে এবং তিনিও শহীদ হয়ে যান। অতঃপর আবু আকীল সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু আকীল আনসারদের মিত্র ছিলেন, ইয়ামামার যুদ্ধের দিন তিনি সর্বপ্রথম যুদ্ধ করতে বের হন। তার গায়ে এ কটি তির বিদ্ধ হয় যা কাঁধ ফুঁড়ে হৃদপিণ্ড পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তিনি সেই তির নিজহাতে টেনে বের করেন। এই আঘাতের ফলে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েন। তিনি মাআ'ন বিন আদীকে বলতে শোনেন, হে আনসার! শত্রুদের ওপর আক্রমণ করার জন্য ফিরে আস। আমর বর্ণনা করেন যে, আবু আকীল তখন নিজ দলের সাথে যোগ দেয়ার জন্য উঠে দাঁড়ান। আমি জিজ্ঞেস করি, আবু আকীল! আপনি কী করতে চাচ্ছেন? আপনার এখন যুদ্ধ করার সামর্থ্য নেই, আপনি অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছেন। তিনি উত্তরে বলেন, যিনি ডাকছেন তিনি আমার নাম ধরে ডেকেছেন। আমি বললাম, তিনি তো শুধু আনসার নাম ধরে ডেকেছেন, তিনি আহতদের উদ্দেশ্য করে তা বলেন নি। আবু আকীল উত্তর দেন, আমি আনসারদের অন্তর্ভুক্ত এবং অন্যরা দুর্বলতা দেখালেও আমি অবশ্যই তার ডাকে সাড়া দেব। ইবনে উমর বলেন, আবু আকীল সাহস করে উঠে দাঁড়ান, ডানহাতে খোলা তরবারি নেন এবং উচ্চস্বরে বলতে থাকেন, হে আনসার! হুনায়নের দিনের মতো পাল্টা আক্রমণ কর। তারা সবাই জড়ো হন এবং শত্রুদের সামনে মুসলমানদের ঢালের মতো হয়ে যান, এমনকি তারা শত্রুদেরকে বাগানে পালাতে বাধ্য করেন। তারা পরস্পর যুদ্ধের জন্য একত্রিত হয় [অর্থাৎ ভেতরে গিয়ে তুমুল যুদ্ধ হয়] এবং তরবারির সাথে তরবারির সংঘর্ষ হতে থাকে। আমি আবু আকীলকে দেখেছি, তার আহত হাত কাঁধ থেকে কাটা পড়েছিল এবং তার সেই হাতটি মাটিতে গিয়ে পড়ে। তার দেহে চৌদ্দটি আঘাত লাগে। সেই আঘাতগুলোর ফলে তিনি শাহাদত বরণ করেন। ইবনে উমর বলেন, আমি যখন আবু আকীলের কাছে পৌঁছি তখন তিনি ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন। আমি ডাকলাম, হে আবু আকীল! তিনি কম্পিত কণ্ঠে বলেন, লাব্বায়েক। এরপর জিজ্ঞেস করেন, কারা পরাজিত হয়েছে? আমি উচ্চকণ্ঠে বলি, সুসংবাদ গ্রহণ করুন! আল্লাহ্‌র শত্রু মুসায়লামা মারা পড়েছে। তিনি 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলতে বলতে নিজের আঙুল আকাশের দিকে ওঠান এবং মৃত্যুবরণ করেন। ইবনে উমর বলেন, আমি আমার পিতা হযরত উমর কে তার পুরো বৃত্তান্ত বর্ণনা করি, তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্ তার প্রতি কৃপা করুন, তিনি সবসময় শাহাদতের আকাঙ্ক্ষা রাখতেন; আর আমার জানামতে তিনি রসূলে করীম (সা.)-এর বাছাইকৃত কয়েকজন সাহাবীর মাঝে অন্যতম ছিলেন এবং তাদের মধ্যে প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারী ছিলেন ।

মুজাআ বিন মুরারা বনু হানীফার নেতা ছিল, তার কথা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে; সে একদিন মাআ'ন বিন আদীর উল্লেখ করতে গিয়ে বলে, তিনি রসূলে করীম (সা.)-এর যুগে আমার কাছে সেই বন্ধুত্বের কারণে আসতেন, যা আমার ও তার মাঝে অনেক আগে থেকেই ছিল। মুজাআ বলেন, তিনি যখন হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে ইয়ামামার যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর প্রতিনিধি দলের সাথে আসেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) একদিন তাঁর সাথীদের নিয়ে শহীদদের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন, আমিও তাদের সাথে বের হই। হযরত আবু বকর (রা.) ও তাঁর সাথীরা সত্তর জন সাহাবীর কবরে যান। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্ র রসূল (সা.)-এর খলীফা! আমি ইয়ামামার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের চেয়ে বেশি অন্য কাউকে তরবারির আক্রমণের সামনে অবিচল থাকতে দেখি নি আর তাদের চেয়ে কঠিন আক্রমণকারীও দেখি নি। তাদের মাঝে আমি এক ব্যক্তিকে দেখেছি, আল্লাহ্ তার প্রতি কৃপা করুন, তার সাথে আমার বন্ধুত্ব ছিল। হযরত আবু বকর (রা.) তা বুঝতে পেরেছেন। তিনি বলেন, (কে) মাআ'ন বিন আদী? আমি নিবেদন করি, হ্যাঁ। হযরত আবু বকর (রা.) আমার ও তার বন্ধুত্ব সম্পর্কে জানতেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তার প্রতি কৃপা করুন। তুমি একজন সালেহ্ ব্যক্তির উল্লেখ করেছ। আমি বলি, হে রসূল (সা.)-এর খলীফা! আমি যেন এখনও আমার কল্পনার চোখে তাকে দেখতে পাচ্ছি। আর আমি খালেদ বিন ওয়ালীদের তাঁবুতে বাঁধা অবস্থায় ছিলাম। মুসলমানদের অবস্থান নড়বড়ে হয়ে যায় আর এতো মারাত্মকভাবে তাদের পদস্খলন হয় যে, আমি ভেবেছিলাম এখন আর (যুদ্ধক্ষেত্রে) তাদের অবস্থা দৃঢ় হওয়া সম্ভব নয়, আর এটি আমি মেনে নিতে পারছিলাম না। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, খোদার কসম! সত্যিই কি এটি তোমার কাছে অসহনীয় ছিল? কেননা সে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল আর এজন্যই বন্দি হয়েছিল। যাহোক, সে বলে, আমি বলি, আল্লাহ্‌র কসম! আমার জন্য তা অসহনীয় ছিল। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, এ কারণে আমি আল্লাহ্‌রপ্রশংসা করছি।

মুজাআ বলেন, আমি মাআ'ন বিন আদীকে দেখি যে, তিনি মাথায় লাল কাপড় বেঁধে পাল্টা আক্রমণ করছিলেন। তরবারি কাঁধের ওপর রাখা ছিল আর সেটি থেকে রক্তবিন্দু ঝরছিল। তিনি উচ্চস্বরে বলছিলেন, হে আনসারগণ! পূর্ণ শক্তি দিয়ে আক্রমণ কর। মুজাআ বলেন, আনসাররা ফিরে গিয়ে আবার আক্রমণ করেন, আর আক্রমণ এতটাই তীব্র ছিল যে, তারা শত্রুদের ভিত টলিয়ে দেন। আমি খালেদ বিন ওয়ালীদের সাথে ঘুরছিলাম (কেননা) আমি বনু হানীফার মৃত ব্যক্তিদেরকে চিনতাম আমি আনসারদেরও দেখছিলাম যে, তারা শহীদ হয়ে পড়েছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) এ কথা শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন, এমনকি তার পবিত্র শ্মশ্রু অশ্রুজলে ভিজে যায়।

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যোহরের সময় হলে আমি বাগানে প্রবেশ করি, তখন প্রচণ্ড যুদ্ধ হচ্ছিল। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) মুয়াজ্জিনকে আদেশ দিলে সে বাগানের দেয়ালের ওপর দাঁড়িয়ে যোহরের আযান দেয়। লোকজন যুদ্ধের কার ণে বিচলিত ছিল। অবশেষে আসরের পর যুদ্ধ শেষ হলে হযরত খালেদ (রা.) আমাদেরকে যোহর ও আসরের নামায পড়ান। অতঃপর যারা পানি পান করাচ্ছিল তাদেরকে শহীদদের দিকে প্রেরণ করেন। আমিও তাদের সাথে ঘুরতে

থাকি, আমি আবু আকীলের পাশ দিয়ে যাই। তিনি ১৫টি আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি আমার কাছে পানি চাইলে আমি তাকে পানি পান করাই আর তার সবগুলো ক্ষত স্থান হতে পানি বের হতে থাকে এবং তিনি শহীদ হয়ে যান। এরপর আমি বিশর বিন আব্দুল্লাহ্‌র পাশ দিয়ে যাই। তিনি স্বস্থানে বসেছিলেন, তিনি আমার কাছে পানি চাইলে আমি তাকে পানি পান করাই আর তিনিও শহীদ হয়ে যান।

মাহমুদ বিন লাবীদ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত খালেদ (রা.) যখন ইয়ামামাবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন তখন মুসলমানরাও এই যুদ্ধে বড় সংখ্যায় শহীদ হন, এমনকি মহানবী (সা.)-এর অধিকাংশ সাহাবী শহীদ হয়ে যান আর মুসলমানদের মধ্য থেকে যারা জীবিত ছিলেন তাদের মাঝে অনেকেই মারাত্মকভাবে আহত ছিলেন।

(আল ইকতিফা, ২য় ভাগ, পৃ: ১) (সীয়ারুস সাহাবিয়াত, প্রণেতা-সাঈদ আনসারী, পৃ: ১২২) (সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক শখসীয়্যত অউর কারনামে, প্রণেতা-সালাবী, পৃ: ৩৪৯)

হযরত খালেদ (রা.)-কে যখন মুসায়লামার নিহত হওয়ার সংবাদ দেওয়া হয় তখন তিনি মুজাআকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় সাথে নিয়ে আসেন যেন মুসায়লামাকে শনাক্ত করা যায়। সে লাশগুলোর মাঝে তার খোঁজ করতে থাকে, কিন্তু সেখানে মুসায়লামাকে পাওয়া যায় নি। অতঃপর সে বাগানে প্রবেশ করলে খাট, পীত বর্ণের, চ্যাপ্টা নাক বিশিষ্ট এক ব্যক্তির লাশ দৃষ্টিগোচর হলে মুজাআ বলে, এ হচ্ছে মুসায়লামা, যার কাছ থেকে তোমরা মুক্তি লাভ করেছ। উত্তরে হযরত খালেদ (রা.) বলেন, এ হচ্ছে সেই লোক, যে তোমাদের সাথে এই সবকিছু করেছে। মুজাআ যেহেতু বন্দি ছিল, আর বনু হানীফার প্রতিনিধি ছিল (এবং) নেতা ছিল, তাই তাদেরকে রক্ষা করতেও চাচ্ছিল। অধিকাংশ যুবক তো নিহত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু সে একটি কৌশল আঁটে। দুর্গে যারা আবদ্ধ ছিল তাদেরকে রক্ষা করার জন্য সে প্রতারণা করে এবং হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-এর সাথে একটি শান্তিচুক্তি করে। সে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-কে বলে, এরা যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল তারা তো ত্বরাপরায়ণ লোক ছিল। কিন্তু দুর্গ এখনও যুদ্ধবাজদের দ্বারা পরিপূর্ণ। হযরত খালেদ (রা.) বলেন, তুমি ধ্বংস হও, বলছো কী! তখন মুজাআ বলে, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি যা বলছি তা নিরেট সত্য বলছি। তাই আসো এবং আমার পশ্চাতে অপেক্ষমান আমার জাতির বিষয়ে আমার সাথে সন্ধি করে নাও। (প্রতারণামূলকভাবে সে এসব কথা বলে, কিন্তু পরবর্তীতে প্রকৃত বিষয় পরিষ্কার হয়ে যাবে)। হযরত খালেদ (রা.) সেই ভয়াবহ যুদ্ধে মুসলমানদের যে পরিমাণ প্রাণহানীর দৃশ্য দেখেছিলেন সে নিরিখে ভাবলেন যে, এখন যেহেতু বনু হানীফার সর্দার এবং মূ ল বিদ্রোহী নাটেরগুরু নিজ সাঙ্গপাঙ্গসহ মারা গেছে তাই এখন মুসলমানদের আর কোনো প্রাণহানী এড়ানোই উত্তম হবে। অতএব হযরত খালেদ (রা.) সন্ধিচুক্তি করতে সম্মত হলেন। হযরত খালেদ (রা.)-এর পক্ষ থেকে মীমাংসার নিশ্চয়তা আদায়ের পর মুজাআ বলে, আমি তাদের কাছে গিয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করে আসি। এরপর সে তাদের কাছে যায় অথচ মুজাআ ভালভাবেই জানতো যে, দুর্গে মহিলা, শিশু এবং চরম বার্ধক্যে উপনীত বৃদ্ধ এবং দুর্বল ব্যক্তিরা ছাড়া আর কেউ ছিল না। সে তাদেরকে বর্ম পরায় আর মহিলাদের পরামর্শ দিয়ে বলে, 'আমি ফিরে আসার আগ পর্যন্ত তোমরা দুর্গের প্রাচীরের ওপর আরোহণ করে সেখানে অবস্থান করবে। এরপর সে খালেদ (রা.)-এর কাছে আসে আর বলে, আমি যে শর্তে সন্ধি করেছিলাম তারা তা মানতে সম্মত নয়। হযরত খালেদ (রা.) যখন দুর্গের দিকে তাকালেন তখন দেখলেন, দুর্গ লোকে লোকারণ্য। (মহিলা এবং অন্যান্যদেরকে বর্ম পরিধান করিয়ে বসিয়ে এসেছিল)। এই যুদ্ধে মুসলমানদের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয় আর যুদ্ধ অতি দীর্ঘ হয়ে যায় তাই মুসলমানরা অর্জিত বিজয় নিয়ে প্রত্যাবর্ত নে আগ্রহী ছিল কেননা তাদের জানা ছিল না যে, ভবিষ্যতে কী হতে যাচ্ছে। তাই খালেদ (রা.) তুলনামূলক নরম শর্তে তথা স্বর্ণ, রৌপ্য, অস্ত্রসস্ত্র এবং অর্ধেক বন্দি প্রাপ্ত হওয়ার শর্তে সন্ধি করে নেন। এমনও কথিত আছে যে, এক চতুর্থাংশ প্রাপ্তির শর্তে সন্ধি করেছিলেন। দুর্গের ফটক যখন খোলা হয় তখন সেখানে মহিলা, শিশু আর দুর্বল ব্যক্তিরা ছাড়া আর কেউ ছিল না। তখন হযরত খালেদ (রা.) মুজাআকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমার অমঙ্গল হোক! তুমি আমাকে ধোকা দিয়েছ। মুজাআ বলে, এরা আমার জাতির লোক আর এদেরকে রক্ষা করা আমার জন্য আবশ্যক ছিল। আমার আর কী-ইবা করার ছিল? এরপর হযরত আবু বকর (রা.)-এর পত্র হযরত খালেদ (রা.)-এর হস্তগত হয় (যাতে লেখা ছিল) প্রত্যেক সাবালক ব্যক্তিকে যেন হত্যা করা হয়। কিন্তু উক্ত পত্র ঠিক তখন পৌঁছায় যখন হযরত খালিদ (রা.) তাদের সাথে সন্ধিচুক্তি করে ফেলেছিলেন। তাই তিনি নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন এবং চুক্তিভঙ্গ করেন নি।

(আল কামিলু ফিত তারিখ লি ইবনে আসীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ২২২-২২৩)

কেননা তাদেরকে তাদের প্রাণের নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। অতএব হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) মুসলমানদের অবস্থা এবং সন্ধির প্রকৃত কারণ বলার উদ্দেশ্যে হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেন, যেটি পড়ে হযরত আবু বকর (রা.) তুষ্ট ও আনন্দিত হন। হযরত খালিদ (রা.) সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন করার পর উক্ত দুর্গের বিষয়ে নির্দেশ জারি করেন। তদনুযায়ী সেখানে লোক নিযুক্ত করা হয়। মুজাআ আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলে, যে যে বিষয়ে সন্ধিচুক্তি হয়েছে তার মধ্য থেকে কোনো জিনিস আপনার দৃষ্টির অগোচরে থাকবে না। আর যে-ই কোন গোপন বিষয়ের জ্ঞান রাখবে যা লুকানো আছে, উক্ত খবর খালিদ (রা.)-এর কর্ণগোচর করা হবে। এরপর দুর্গ খুলে দেওয়া হয়। অঢেল অস্ত্রসস্ত্র হস্তগত হয় এবং সেগুলো হযরত খালিদ (রা.) একত্রিত করেন আর সেই দুর্গ থেকে যে দিনার ও দিরহাম লাভ হয়- সেগুলোও পৃথকভাবে একত্রিত করা হয় আর বর্মগুলোও একত্রিত করা হয় এবং বন্দীদেরকে দুর্গের বাইরে বের করে তাদেরকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। এরপর গণিমতের মালের বিষয়ে লটারী করা হয়। বর্ম এবং বেড়ি আর স্বর্ণ ও রৌপ্য পরিমাপ করা হয় এবং সেখান থেকে খুম্‌স (তথা খলীফার জন্য নির্ধারিত এক পঞ্চমাংশ) পৃথক করা হয়। খুম্‌স এর চারভাগ (প্রাপক) সকলের মাঝে বন্টন করা হয়। ঘোড় সোয়ারীদের জন্য দুই অংশ নির্ধারণ করা হয় আর ঘোড়ার মালিকের জন্য এক অংশ নির্ধারণ করা হয়। আর সেগুলোর মাঝ থেকে 'খুম্‌স' পৃথক করা হয় এবং সমস্ত 'খুম্‌স' হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর কাছে প্রেরণ করা হয়।

(আল ইকতিফা, ২য় ভাগ, ১ম খণ্ড, পৃ: ৭০-৭১)

এরপর বনু হানীফা বয়আত করার লক্ষ্যে এবং মুসায়লামার নবুয়্যতের সাথে কোন প্রকার সংশ্লিষ্টতার কথা অস্বীকার করার জন্য একত্রিত হয়। সকলকে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর কাছে আনা হয়। সেখানে তারা বয়আত করে এবং পুনরায় নিজেদের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) তাদের একটি প্রতিনিধিদল হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর কাছে মদিনাতে প্রেরণ করেন। তারা যখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর কাছে পৌঁছে তখন তিনি (রা.) বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, তোমরা কীভাবে মুসায়লামার ফাঁদে পা দিলে এবং পথভ্রষ্ট হয়ে গেলে? তারা জবাবে বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূলের খলীফা! আমাদের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে আপনি ভালভাবে অবগত। মুসায়লামা নিজেরও উপকার করে নি এবং তার আত্মীয়-স্বজন ও জাতির লোকেরাও তার থেকে উপকৃত হতে পারে নি।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা-মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ২০৬)

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর একটি স্বপ্নের উল্লেখ আছে। হযরত আবু বকর (রা.) যখন হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-কে (সৈন্যসামান্তসহ) ইয়ামামা প্রেরণ করেন তখন তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তাঁর কাছে হাজ্‌র জনবসতির কিছু খেজুর আনা হয়। তিনি সেগুলো থেকে একটি খেজুর খেলেন। কিন্তু দেখলেন সেটি খেজুর নয় বরং খেজুর সদৃশ খেজুরের বীজ যা বেশ শক্ত। তিনি কিছুক্ষন সেটিকে চিবালেন এরপর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তিনি তাঁর স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে বলেন, খালিদকে ইয়ামামাবাসীর পক্ষ থেকে কঠিন মোকাবেলার সম্মুখীন হতে হবে; আল্লাহ তা'লা অবশ্যই তার হাতে বিজয় দান করবেন।

(আল ইকতিফা, ২য় খণ্ড, ১ভাগ, পৃ: ৭২)

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ইয়ামামা থেকে আগত সংবাদের অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন। আর যখনই খালিদের পক্ষ থেকে কোন দূত আসত, তিনি (রা.) তার কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করতেন। একদিন হযরত আবু বকর (রা.) দুপুরের দাবদাহে বের হন। তিনি 'সারার' নামক স্থানে যেতে চাচ্ছিলেন যেটি মদিনা থেকে তিন মাইল দুরত্বে অবস্থিত ছিল। তাঁর সাথে হযরত উমর (রা.), হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.), হযরত তোলায়হা বিন উবায়দুল্লাহ (রা.) এবং মুহাজের ও আনসারদের একটি দল ছিল। পথিমধ্যে আবু খায়সামা নাজ্জারীর সাথে তার (রা.) সাক্ষাৎ হয়, যাকে খালিদ (রা.) প্রেরণ করেছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) যখন তাকে দেখে জিজ্ঞেস করেন, হে আবু খায়সামা! খবর কী? তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রসূলের খলীফা! খবর খুব ভাল। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে ইয়ামামার বিরুদ্ধে বিজয় দান করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) (কৃতজ্ঞতার) সিজদা করেন। আবু খায়সামা বলেন, আপনার নামে খালিদ (রা.) -এর পত্র আছে। হযরত আবু বকর (রা.) এবং তাঁর সাহাবীগণ আল্লাহ তা'লার প্রশংসা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, যুদ্ধের বিষয়ে আমাকে বল যে, কেমন যুদ্ধ হয়েছিল? আবু খায়সামা হযরত খালিদ (রা.)-এর বিস্তারিত কার্যক্রম সবিস্তারে বর্ণনা করতে থাকেন

যে, কীভাবে তিনি তার সঙ্গীদেরকে সারিবদ্ধ করেছিলেন, কীভাবে মুসলমানরা পরাজয়ের সম্মুখীন হয়, তাদের মধ্যে কারা শহীদ হন। হযরত আবু বকর (রা.) ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন পড়েন এবং তাদের অনুকূলে খোদার রহমতের দোয়া করেন। আবু খায়সামা আরও বলেন, হে আল্লাহর রসূলের খলীফা! আমরা বেদুঈন। তারা আমাদেরকে পরাজিত করে এবং আমাদের সাথে তা করে যা আমরা ভাল মনে করতাম না। এরপর আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে তাদের ওপর বিজয় দান করেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি যা স্বপ্ন দেখেছিলাম সেটিকে আমি ভীষণ অপছন্দ করতাম। আর আমার মনে এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, খালিদকে নিশ্চয়ই ভয়াবহ যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হবে। খালিদ যদি তাদের সাথে সন্ধি না করতো এবং তাদেরকে তরবারির আঘাতে ছিন্নভিন্ন করতো তাহলে ভাল হতো। এসব শহীদদের পর ইয়ামামাবাসীদের মধ্য থেকে কারো বেঁচে থাকার কী অধিকার আছে? তিনি (রা.) বলেন, মুসায়লামা কায্যাবের সঙ্গীসাথীরা তার কারণে কিয়ামত পর্যন্ত পরীক্ষায় নিপতিত থাকবে, তবে হ্যাঁ, আল্লাহ্ যদি তাদেরকে রক্ষা করেন সেকথা ভিন্ন। এরপর ইয়ামামার প্রতিনিধিদল হযরত খালিদের সাথে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়।

(আল ইকতিফা, ২য় খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃ: ৭২-৭৩) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ১৭২)

নিহতদের সংখ্যা সম্পর্কে কথিত আছে, এ যুদ্ধে নিহত মুরতাদদের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। অপর এক রেওয়ায়েতে একুশ হাজারও বর্ণিত হয়েছে।অপরদিকে প্রায় পাঁচশ' কিংবা ছয়শ' মুসলমান শহীদ হন। কোন কোন রেওয়ায়েতে ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ মুসলমানদের সংখ্যা সাতশ', বারশ' এবং সতেরশ' পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে।

(আল বাদাইয়াতু ওয়ান নাহাইয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬ষ্ঠ ভাগ, পৃ: ৩২১)

একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী এই যুদ্ধে সাতশ'র অধিক কুরআনের হাফিয শহীদ হয়েছিলেন।

(উমদাতুল ক্বারী শারাহা সহীহ বুখারী, কিতাবু ফাযাইলিল কুরআন, খণ্ড-২০, পৃ: ২৩)

এই শহীদদের মাঝে জ্যেষ্ঠ সাহাবা এবং কুরআনের হাফিযগণও ছিলেন যাদের সম্মান ও পদমর্যাদা মুসলমানদের দৃষ্টিতে অনেক উঁচু ছিল। তাদের শাহাদত অনেক বড় এক মর্মন্তুদ ঘটনা ছিল, কিন্তু এই কুরআনের হাফিযদের শাহাদতই পরবর্তীতে কুরআন সংকলনের কারণ হয়। এই শহীদদের মধ্যে কয়েকজন বিখ্যাত সাহাবীর নাম হল, হযরত যায়েদ বিন খাত্তাব (রা.), হযরত আবু হুযায়ফা বিন রবীয়্যা (রা.), আবু হুযায়ফা (রা.)-এর মুক্ত কৃতদাস হযরত সালেম, হযরত খালিদ বিন উসায়েদ (রা.), হযরত হাকাম বিন সাঈদ (রা.), হযরত তুফায়েল বিন আমর দওসী (রা.), হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)'র ভাই হযরত সায়েব বিন আওয়াম (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন হারেস বিন কায়েস (রা.), হযরত আব্বাদ বিন হারেস (রা.), হযরত আব্বাদ বিন বিশর (রা.), হযরত মালিক বিন অওস (রা.), হযরত সুরাকা বিন কা'ব (রা.), মহানবী (সা.)-এর খতীব হযরত মা'আন বিন আদী (রা.), হযরত সাবেত বিন কায়েস বিন শিমাস (রা.), হযরত আবু দুজানা (রা.), মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল-এর নিষ্ঠাবান মু'মিন পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ এবং হযরত ইয়াযীদ বিন সাবেত খাযরাজী (রা.)।

(ফুতুহুল বুলদান, পৃ: ১২৪-১২৬)

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ইয়ামামার যুদ্ধ দ্বাদশ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে হয়েছিল পক্ষান্তরে অনেকের মতে এটি এগারো হিজরীর শেষদিকে হয়। এই উভয় উক্তির মাঝে মিল বা সামঞ্জস্য এভাবে হতে পারে যে, (হয়তো) এগারো হিজরীতেই যুদ্ধের সূচনা হয়ে থাকবে এবং বারো হিজরীতে গিয়ে (তা) শেষ হয়েছে।

(আল বাদাইয়াতু ওয়ান নাহাইয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬ষ্ঠ ভাগ, পৃ: ৩২২)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন,

"যারা (মিথ্যা নবুয়্যতের) দাবি করেছিল এবং যাদের সাথে সাহাবীরা যুদ্ধ করেন- তারা সবাই ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল ও ইসলামী রাষ্ট্রের বিপক্ষে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছিল। মুসায়লামা তো স্বয়ং মহানবী (সা.) -এর যুগে তাঁকে (সা.) লিখেছিল, আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আরবের অর্ধেক জমিন আমাদের এবং অর্ধেক কুরাইশদের জন্য। আর মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর সে হাজর ও ইয়ামামা থেকে তাঁর নিযুক্ত গভর্নর সুমামা বিন উসাল-কে বহিষ্কার করে এবং নিজেই সেখানকার গভর্নর সেজে বসে আর মুসলমানদের ওপর সে আক্রমন করে। অনুরূপভাবে মদীনার দু'জন সাহাবী হাবীব বিন যায়েদ এবং আব্দুল্লাহ্ বিন ওয়াহ্হাব'কে সে আটক করে এবং বাহুবলে তাদেরকে নিজের নবুওয়্যত স্বীকার করানোর অপচেষ্টা করে। আব্দুল্লাহ্ বিন ওয়াহ্হাব ভীত হয়ে তার কথা মেনে নেন কিন্তু হাবীব বিন যায়েদ তার কথা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এ কারণে মুসায়লামা তার অঙ্গ -প্রত্যঙ্গ, একে একে কেটে আগুনে পুড়িয়ে ফেলে।একইভাবে ইয়েমেনেও মহানবী (সা.) কর্তৃক নিযুক্ত কতক কর্মকর্তাকে সে বন্দী করে আর কতককে কঠোর শাস্তি দেয়। অনুরূপভাবে তাবারী লিখেছেন যে, আসওয়াদ আনসীও বিদ্রোহ সৃষ্টি করেছিল এবং মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে যেসব কর্মকর্তা নিযুক্ত ছিল তাদেরকে সে কষ্ট দিয়েছিল এবং তাদের কাছ থেকে যাকাত ছিনিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। এরপর সে সানআ'তে মহানবী (সা.)-এর নিযুক্ত শাসক শাহ্র বিন বাযান-এর ওপর আক্রমণ করেছিল। অনেক মুসলমানকে (সে) শহীদ করে, লুটতরাজ করে, গভর্নরকে হত্যা করে এবং তাকে হত্যা করার পর তার মুসলমান স্ত্রীকে জোরপূর্বক বিয়ে করে। বনূ নাজরানও বিদ্রোহ করেছিল এবং তারাও আসওয়াদ আনসী'র দলে যোগ দেয় আর তারা দু'জন সাহাবী আমর বিন হাযম এবং খালিদ বিন সাঈদ'কে (তাদের) এলাকা থেকে বহিষ্কার করে।

এসব ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মিথ্যা নবুয়্যতের দাবিকারকদের সাথে এজন্য যুদ্ধ করা হয় নি যে, তারা মহানবী (সা.)-এর উম্মতে নবী হওয়ার দাবি করেছিল; আর মহানবী (সা.)-এর ধর্ম প্রচারের দাবি করেছিল বরং তাদের সাথে সাহাবীদের যুদ্ধ করার কারণ হল, তারা ইসলামী শরীয়তকে রহিত করে নিজেদের মনগড়া আইন প্রবর্তন করে এবং নিজ নিজ অঞ্চলের (স্বঘোষিত) শাসক হবার দাবি করে। শুধু আঞ্চলিক শাসক হবার দাবিদারই ছিল না বরং তারা সাহাবীদেরকে হত্যা(ও) করেছে।

(মৌলানা মৌদুদী সাহেব কে রিসালাহ 'কাদিয়ানী মাসলা' কা জওয়াব, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড=২৪, পৃ: ১২-১৪)

মুসলিম শাসিত অঞ্চলে সেনাভিযান চালিয়েছে, প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছে।

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেন,

"মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর আরবের বেদুঈনরা মুরতাদ হয়ে যায়। এহেন সংকটাপন্ন সময়ের চিত্র হযরত আয়েশা (রা.) এভাবে তুলে ধরেন যে, আল্লাহ্র নবী (সা.) সবে পরলোক গমণ করেছেন আর অমনি কোন কোন মিথ্যা নবুয়্যতের দাবিকারকের অভ্যুদয় ঘটে আর কিছু লোক নামায পরিত্যাগ করে এবং (তাদের) আচরণ পাল্টে যায়। এহেন পরিস্থিতিতে ও এমন বিপদসঙ্কুল অবস্থায় আমার পিতা মহানবী (সা.)-এর খলীফা এবং স্থলাভিষিক্ত (নিযুক্ত) হন। আমার পিতার ওপর এমন সব দুঃখ-যাতনা এসেছে যে, তা যদি পর্বতের ওপর আপতিত হতো তবে তাও মাটিতে মিশে যেত। এখন গভীরভাবে প্রণিধান কর, বিপদাবলীর পর্বত ভেঙ্গে পড়া সত্ত্বেও সাহস ও মনোবল না হারানো; এটি কোন সাধারণ মানুষের কাজ নয়। এই অবিচলতা সিদ্ক বা নিষ্ঠার দাবি রাখতো আর "সিদ্দীক"-ই তা দেখিয়েছেন। এই সংকট মোকবিলা করা অন্য কারও জন্য অসম্ভব ছিল। সকল সাহাবী তখন উপস্থিত ছিলেন। কেউ একথা বলে নি যে, এটি আমার প্রাপ্য। তারা দেখছিল যে, আগুন লেগে গেছে। এই আগুনে কে ঝাঁপ দেবে? এমন সময় হযরত উমর (রা.) হাত বাড়িয়ে তাঁর হাতে বয়আত করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে সবাই বয়আত করেন। তাঁর (রা.) এই সিদ্ক বা নিষ্ঠাই এই নৈরাজ্যকে দমন করে আর সেসব অনিষ্টকারীকে ধ্বংস করে। মুসায়লামা'র সাথে এক লক্ষ মানুষ ছিল আর তার বিষয়টি ছিল 'এবাহাত' (অর্থাৎ শরীয়ত পরিপন্থী বিষয়সমূহকে বৈধতা প্রদান) সংক্রান্ত সমস্যা। 'এবাহাত' হল, শরীয়তে কোন বিষয়কে বৈধতা প্রদান বা হালাল আখ্যা দেওয়া। জনগণ তার মনগড়া কথাবার্তা দেখে তার দলভুক্ত হতে থাকে। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, সে অনেক অন্যায্য বিষয়কে বৈধ আখ্যা দেয়।

মোটকথা, 'এবাহাত' (অর্থাৎ শরীয়ত পরিপন্থী বিষয়সমূহকে বৈধতা প্রদান) সংক্রান্ত বিষয়গুলো লক্ষ্য করে জনগণ তার ধর্মের অনুসারী হতে থাকে কিন্তু খোদা তা'লা তার সাথে থাকার প্রমাণ দিয়েছেন এবং সকল সংকটকে সহজ করে দেন। "

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৭৮-৩৭৯)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "গবেষকদের কাছে এটি অবিদিত নয় যে, তাঁর খিলাফতকাল আশঙ্কা ও বিপদসংকুল যুগ ছিল। যেমন - মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর বিপদাবলী নেমে আসে। অগণিত মুনাফিক মুরতাদ হয়ে যায় আর মুরতাদরা ধৃষ্ট হয়ে ওঠে। মিথ্যাবাদীদের এক শ্রেণি নবুয়্যতের দাবি করে বসে আর অগণিত

মরুবাসী বেদুঈন তাদের দলে যোগ দেয়। এক পর্যায়ে মুসায়লামা কায্যাবের সাথে প্রায় এক লক্ষ অজ্ঞ ও দুরাচারী লোক যোগ দেয়। নৈরাজ্য ফুঁসে ওঠে, সমস্যা ঘনিভূত হয়, দূর-নিকটের সবকিছুই সমস্যা কবলিত হয়ে যায় আর মু'মিনর া প্রচণ্ডভাবে প্রকম্পিত হন। এমতাবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি পরীক্ষার সম্মুখীন হয় আর কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাওয়ার মত ভীতিপ্রদ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। মু'মিনরা এতটাই ছটফট করছিলেন যেন তাদের হৃদয়ে কয়লার আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল অথবা তাদেরকে ছুরি দিয়ে জবাই করে দেওয়া হয়েছে। একদিকে তারা শ্রেষ্ঠ মানব (সা.)-এর বিয়োগান্তক বেদনায় কাঁদছিলেন অপরদিকে সেসব অরাজকতার কারণে অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছিলেন যা ভস্মকারী অগ্নির ন্যায় আবির্ভূত হয়েছিল। কোথাও শান্তির কোন নামগন্ধও ছিল না। নৈরাজ্যবাদীরা আবর্জনার স্তুপে গজিয়ে ওঠা সবুজ ঘাসের মত ছড়িয়ে পড়েছিল। মু'মিনদের ভয় এবং তাদের ভীতি অনেক বেড়ে গিয়েছিল আর তাদের হৃদয় আতঙ্ক ও অস্থিরতায় জর্জরিত ছিল।

এমন স্পর্শকাতর সময়ে হযরত আবু বকর (রা.) যুগের শাসক ও হযরত খাতামুন্নবীঈন (রা.)-এর খলীফা মনোনীত হন। মুনাফেক, কাফের ও মুরতাদদের যেসব আচার আচরণ এবং রীতিনীতি তিনি (রা.) প্রত্যক্ষ করেছেন তাতে তিনি (রা.) দুঃখ শোকে মুহ্যমান ছিলেন। তিনি (রা.) শ্রাবণবারির ন্যায় অঝোরে কাঁদতেন এবং তাঁর অশ্রু বহমান ঝর্ণার মত বইতে থাকে আর তিনি (রা.) তার আল্লাহ্‌র দরবারে ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণের জন্য দোয়া করতেন।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি (রা.) বলেন, আমার শ্রদ্ধেয় পিতাকে যখন খলীফা মনোনীত করা হয় এবং আল্লাহ্ তাঁর হাতে আমীরের দায়িত্ব ন্যস্ত করেন তখন খিলাফতের সূচনাতেই তিনি সব দিক থেকে নৈরাজ্যের উত্তাল ঢেউ, মিথ্যা নবুয়্যতের দাবিদারদের দুর্বার ষড়যন্ত্র এবং মুনাফেক ও মুরতাদদের বিদ্রোহ প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর ওপর এত বেশি বিপদাপদ নেমে আসে যে, তা যদি কোন পাহাড়ের ওপরও পড়ত তাহলে তা-ও মাটিতে ধ্বসে যেতো এবং তৎক্ষণাৎ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু তাঁকে রসূলদের মত ধৈর্য দেওয়া হয়েছে। এমন অবস্থায় আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন এসে যায় এবং মিথ্যা নবীদের হত্যা ও মুরতাদদের ধ্বংস করে দেয়া হয়। বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য এবং বিপদাপদ দূর হয়ে যায়, বিভিন্ন বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয়ে যায় আর খিলাফতের বিষয়টি সুদৃঢ় হয়ে যায়। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদেরকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন, তাদের ভয়ভীতির অবস্থাকে নিরাপত্তায় বদলে দেন, তাদের জন্য তাদের ধর্মকে সুদৃঢ় করেন, সত্যের ওপর এক জগতকে একত্র করে দেন এবং নৈরাজ্যবাদীদের মুখে কালিমা লেপন করেন। নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন আর নিজ বান্দা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)কে সাহায্য ও সমর্থন করেন, অবাধ্য নেতাদের এবং মূর্তিগুলোকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেন আর কাফেরদের হৃদয়ে এমন ত্রাসের সঞ্চার করেন যে, তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। অবশেষে তারা প্রত্যাবর্তন করে তওবা করে আর এটিই কাহ্হার খোদার প্রতিশ্রুতি ছিল এবং তিনিই সর্বাধিক সত্যবাদী। অতএব গভীরভাবে চিন্তা করে দেখ! খিলাফতের প্রতিশ্রুতি নিজের সমস্ত অনুষঙ্গ ও লক্ষণাদিসহ হযরত আবু বকর (রা.)-এর সত্তায় কীভাবে পূর্ণ হয়েছে!"

(সিররুল খোলাফা, উর্দু অনুবাদ, পৃ: ৪৭-৫০)

হযরত খালেদ (রা.) সম্পর্কে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (রা.) ইয়ামামার অভিযান শেষ করে সেখানেই অবস্থান করছিলেন, এমন সময় হযরত আবু বকর (রা.) তাকে লিখেন, ইরাকের উদ্দেশ্যে যাত্রা কর।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩০৭)

একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত আলা বিন হাযরামী (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট সহায়ক সৈন্য চেয়ে পাঠান। তখন তিনি (রা.) খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)কে এমর্মে পত্র লিখে নির্দেশ প্রদান করেন, ইয়ামামা থেকে যাত্রা করে যত দ্রুত সম্ভব আলার নিকট চলে যাও এবং তাকে সাহায্য কর। ফলে তিনি (রা.) তাদের সাহায্যার্থে সেখানে পৌঁছে যান, হুতমকে হত্যা করেন আর এরপর তাদের সাথে যুক্ত হয়ে 'খুত' অবরোধ করেন। 'খুত'ও বাহরাইনে আব্দে কায়েসের একটি মহল্লা যেখানে অনেক বেশি খেজুর হয়। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) তাকে ইরাকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার নির্দেশ দিলে তিনি (রা.) বাহারাইন থেকে সেই দিকে যাত্রা করেন।(ফুতুহুল বুলদান, প্রণেতা-বালাযারী, অনুবাদ, পৃ: ১৩৫)

মুজাআ বিন মুরারার মেয়ের সাথে হযরত খালেদ (রা.)-এর বিয়ে সম্পর্কে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে থাকে সে সম্পর্কে জীবনচরিত ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহে লিখা রয়েছে, ইমামার যুদ্ধ শেষে বনু হানিফার অবশিষ্ট জীবিত লোকদের সাথে সন্ধির পর হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-এর একটি বিয়ে হয়েছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকদের মতে এই বিয়ের সংবাদ পাওয়ার পর হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালেদ (রা.)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু হযরত খালেদ (রা.) যখন পত্র মারফত বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন তখন হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমস্ত অসন্তুষ্টি দূর হয়ে যায়। বিবরণ অনুসারে সন্ধি হয়ে যাওয়ার পর হযরত খালেদ (রা.) মুজাআর কাছে তার মেয়ের জন্য বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। মালেক বিন নুয়ায়রার স্ত্রী লায়লা উম্মে তামীমের ঘটনা এবং এই বিয়ের ফলে হযরত খালেদ (রা.)-এর প্রতি হযরত আবু বকর (রা.)-এর অসন্তুষ্টি সম্পর্কেও মুজাআ অবগত ছিল। কাজেই সে বলে, আপনি বিরত হোন। অন্যথায় আপনি আমার কোমর ভেঙে ফেলার কারণ হবেন আর আপনি নিজেও হযরত আবু বকর (রা.)-এর অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা পাবেন না। কিন্তু হযরত খালেদ (রা.) বলেন, তুমি আমার কাছে তোমার মেয়ে বিয়ে দাও। অতএব সে তার কন্যাকে তাঁর কাছে বিয়ে দেয়। হযরত আবু বকর (রা.) ইয়ামামার সংবাদের জন্য সর্বদা অপেক্ষমান থাকতেন আর তিনি (রা.) হযরত খালেদ (রা.)-এর বার্তাবাহকের অপেক্ষায় থাকতেন। একদিন সন্ধ্যায় তিনি (রা.) মুহাজের ও আনসারদের একটি দলের সাথে একটি স্থানে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় হযরত খালেদ (রা.)-এর দূত হযরত আবু খায়সামা (রা.)-এর সাথে তঁ ার সাক্ষাত হয়। তাকে দেখার পর হযরত আবু বকর (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, খবর কী? তিনি (রা.) নিবেদন করেন, হে রসূলের খলীফা! সংবাদ ভাল। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ইয়ামামায় বিজয় দান করেছেন আর হযরত খালেদ (রা.)-এর এই পত্রটি গ্রহণ করুন। হযরত আবু বকর (রা.) তৎক্ষনাৎ কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনমূলক সিজদা করেন এবং বলেন, আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা সম্পর্কে অবগত কর, কীভাবে এটি সম্ভব হয়েছে। এ সম্পর্কে পূর্বেও একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। যাহোক, হযরত আবু খায়সামা (রা.) যুদ্ধক্ষেত্রের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরতে গিয়ে হযরত খালেদ (রা.) কী করেছেন তা বর্ণনা করেন। কীভাবে সেনাবাহিনীকে বিন্যস্ত করেছেন, কোন্ কোন্ সাহাবী শহীদ হয়েছেন এবং কীভাবে আমাদেরকে শত্রুদের মুখোমুখি হতে হয়েছে। আরো বলেন যে তারা আমাদেরকে এমন জিনিসে অভ্যস্ত করেছে যেটা আমরা ভালোভাবে জানতাম না।

এরপর হযরত খালেদ (রা.)-এর বিয়ের কথাও আসে। হযরত আবু বকর (রা.) তাকে পত্র লিখেন, হে উম্মে খালেদের পুত্র! তুমি নারীদের সাথে বিয়ের আনন্দে মত্ত হয়েছ অথচ এখনো তোমার উঠানে এক হাজার দুইশত মুসলমানের রক্ত শুকায় নি। অপরদিকে মুজাআ তোমাকে ধোঁকা দিয়ে সন্ধি করে ফেলেছে অথচ আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে তাদের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব দান করেছিলেন। মুজাআর সাথে সন্ধি আর তার মেয়ের সাথে বিবাহের কারণে রসূলের খলীফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর পক্ষ থেকে এই অসন্তুষ্টির কথা হযরত খালেদ (রা.)-এর কাছে পৌঁছালে তিনি (রা.) উত্তরে পত্র লিখে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমীপে প্রেরণ করেন। সেই পত্রে তার অবস্থান স্পষ্ট করেন আর আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি (রা.) লিখেন। তিনি লিখেন, আম্মা বা'দ, ধর্মের শপথ! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত বিয়ে করি ি ন যতক্ষণ আনন্দ করার মত পরিবেশ সৃষ্টি হয় নি এবং পরিস্থিতি নিশ্চিৎ হয় নি। আমি এমন ব্যক্তির মেয়েকে বিয়ে করেছি যে, মদিনা থেকেও যদি আমি প্রস্তাব পাঠাতাম সে প্রত্যাখ্যান করত না। আমাকে ক্ষমা করবেন! আমি নিজ অবস্থান থেকে প্রস্তাব দেয়াকে প্রাধান্য দিয়েছি। আপনার কাছে যদি এ বিয়ে ধর্মীয় কিংবা জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অপছন্দনীয় হয় তাহলে আমি আপনার ইচ্ছা পূরণের জন্য প্রস্তুত আছি। বাকি থাকল নিহত মুসলমানদের শোক পালনের বিষয়টি। এ সম্পর্কে বক্তব্য হল কারো শোক প্রকাশ যদি কোন জীবিতকে বাঁচিয়ে রাখতে পারত অথবা কোন মৃতকে ফেরত আনতে পারত তাহলে আমার শোক প্রকাশ ও জীবিতকে বাঁচিয়ে রাখত আর মৃতকে ফেরত আনত। আমি এভাবে আক্রমণ করেছি যে, জীবন থেকে নিরাশ হয়ে গেছি এবং মৃত্যু নিশ্চিত জ্ঞান করেছি। মুজাআর ধোঁকা দেয়ার যতটুকু সম্পর্ক আছে সেক্ষেত্রে আমি আমার সিদ্ধান্তে ভুল করি নি। কিন্তু আমাকে অদৃশ্যের জ্ঞান দেয়া হয় নি। আল্লাহ্ যা করেছেন মুসলমানদের মঙ্গলের জন্য করেছেন। তাদেরকে ভূপৃষ্ঠের উত্তরাধিকারী করেছেন আর উত্তম পরিণাম তো কেবল মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত। এ পত্রটি হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে পৌঁছালে তাঁর রাগ প্রসমিত হয়ে যায়। এছাড়া কুরাইশদের একটি দল এবং যেব্যক্তি হযরত খালেদ (রা.)-এর পত্র নিয়ে এসেছিল সেও হযরত খালেদ (রা.)-এর নির্দোষ হওয়ার কথা বলে। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তোমরা সত্য বলছ; আর তিনি হযরত খালেদ (রা.)-এর ব্যাখ্যা ও ক্ষমার আবেদন গ্রহণ করেন। মুরতাদ সংক্রান্ত ঘটনা এখানেই সমাপ্ত হল। অবশিষ্ট ঘটনা ভবিষ্যতে বর্ণিত হবে ইনশাআল্লাহ্।

জুমআর খুতবা

যেহেতু একজন নবী খোদা তা'লার নাম শুনে পরম বিনয় প্রদর্শন করেন এবং তাঁর মাহাত্ম্যের প্রতি গভীর অনুরাগ রাখেন, তার এই কথা শুনে তিনি (সা.) তাৎক্ষণিক বলেন, তুমি অনেক বড় সত্তার দোহাই দিয়েছ এবং তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করেছ, যিনি সর্বোত্তম আশ্রয়দাতা; তাই আমি তোমার অনুরোধ গ্রহণ করছি। অতএব তিনি (সা.) তখনই বাইরে বের হয়ে আসেন এবং বলেন, হে আবু উসায়েদ! তাকে দুটি চাদর দিয়ে দাও এবং তার পরিবারের কাছে তাকে পৌঁছে দাও।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহান মর্যাদাবান সাহাবী এবং খলীফায়ে রাশেদ হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-এর যুগে বিদ্রোহী ও ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে অভিযানসমূহের বর্ণনা।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত** ১৭ জুন , ২০২২, **এর জুমুআর খুতবা (১৭এহসান, ১৪০১ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পা ঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: গত খুতবায় আমি বলেছিলাম, ইয়ামামার প্রেক্ষাপটে মুরতাদ বা মুনাফেকদের ঘটনা অর্থাৎ মুসায়লামা কায্যাব ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের যে ঘটনা ছিল তা (বর্ণনা করা) শেষ হয়েছে।

এছাড়া হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকালে যেসব মুরতাদ অস্ত্র ধারণ করেছিল তাদের আলোচনা চলছিল।

যেভাবে আমি ইতোপূর্বেই বর্ণনা করেছি, অনেকগুলো অভিযান ছিল। প্রথম অভিযানের কথা বর্ণিত হয়েছে আর তা অনেক দীর্ঘ ছিল। এখন অবশিষ্ট দশটি অভিযানের দুটি বা তিনটির বর্ণনায় যা রয়েছে তা হল- হযরত হুযায়ফা এবং হযরত আরফাযা (রা.)-এর মাধ্যমে এই অভিযানটি সম্পন্ন করা হয় যা ওমানের বিদ্রোহী মুরতাদ দের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। ওমান বাহ্রাইনের নিকট ইয়ামেনের একটি শহর। ওমান পারস্য উপসাগর ও আরব সাগরের মাঝে অবস্থিত, যাতে সে যুগে বর্তমান সংযুক্ত আরব আমীরাতের পূর্বাঞ্চলও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখানে মুশরিক গোত্র আযদ এবং অন্য কয়েকটি গোত্র বসবাস করত, যারা অগ্নীপূজারি ছিল। মাস্কাট, সুহার ও দাবা এখানকার উপকূলীয় শহর ছিল। মহানবী (সা.)-এর কল্যাণময় যুগে ওমান পারস্য সাম্রাজ্যের অধিনে ছিল এবং তাদের পক্ষ থেকে জেফর নামের এক ব্যক্তি গভর্ণর নিযুক্ত ছিল। সে অঞ্চলে মজুসী ধর্ম বিস্তৃত ছিল। মহানবী (সা.) ৮ম হিজরী সনে হযরত আবু যায়েদ আনসারী (রা.)কে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এবং হযরত আমর বিন আস (রা.)কে এখানকার নেতা দুই ভাই জেফর বিন জুলুন্দায় ও আব্বাদ জুলুন্দায়ের নামে পত্রসহ প্রেরণ করেন।

মহানবী (সা.)-এর এই পত্রের বিষয়বস্তু ছিল-

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। এ পত্রটি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর পক্ষ থেকে জুলুন্দায়ের দু'পুত্র জেফর ও আব্বাদের প্রতি প্রেরিত হচ্ছে। তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক যে হেদায়াতের অনুসরণ করেছে। আমি আপনাদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার আহ্বান জানাচ্ছি। আপনারা ইসলাম গ্রহণ করলে নিরাপদ থাকবেন। আমি আল্লাহর রসূল এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য প্রেরিত হয়েছি যাতে প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তিকে সতর্ক করতে পারি এবং কাফেরদের কাছে অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ তুলে ধরতে পারি। আপনারা যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে রীতি অনুসারে আমি আপনাদেরকে সেখানকার শাসক থাকতে দিব, কিন্তু আপনারা যদি ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান তাহলে আপনাদের কাছ থেকে আপনাদের রাজত্ব হারিয়ে যাবে।

(সীরাত হযরত উমর বিন আস, পৃ: ৪৯)(ফুতুহুল বুলদান, পৃ: ১০৩-১০৪) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ২০৯)

কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে বেশ কিছুদিন আলোচনার পর এই দুই ভাই ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু এক রেওয়ায়েত অনুসারে ওমানের শাসক জেফর বলেন, ইসলাম গ্রহণে আমার কোন আপত্তি নেই তবে আশংকা হলো, আমি যদি এখান থেকে যাকাত সংগ্রহ করে মদিনায় প্রেরণ করি তাহলে আমার জাতি আমার বিরুদ্ধাচারণ করবে। একথা শুনে হযরত আমর বিন আস (রা.) যে প্রস্তাব দেন তা হল- অত্র অঞ্চল থেকে যাকাতের যে সম্পদ আদায় হবে তা এই অঞ্চলের দরিদ্রদের জন্যই ব্যয় করা হবে। ফলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আমর বিন আস (রা.) এখানে দুই বছর অবস্থান করেন এবং মানুষের মাঝে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। তাঁর এই সফল তবলীগি প্রচেষ্টার ফলে সেই অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর যখন আরবের চতুর্দিকে ধর্মত্যাগের ব্যাধি ও বিদ্রোহ মাথা চাড়া দেয় তখন হযরত আবু বকর (রা.) হযরত আমর বিন আস (রা.)কে ওমান থেকে মদিনায় ডেকে পাঠান। অপরদিকে মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর তাদের মাঝে লাকীদ বিন মালেক আযদীর অভ্যুদয় ঘটে। তার উপাধি ছিল 'যুল তাজ' আর অজ্ঞতার যুগে তাকে ওমানের বাদশা জুলুন্দায়ের সমপর্যায়ের লোক মনে করা হত। ওমানের বাদশাহদের উপাধি ছিল জুলুন্দায়। যাহোক, সে নবুওয়্যতের দাবি করে বসে এবং ওমানের অজ্ঞরা তার অনুসরণ করে। সে ওমান দখল করে নেয়। জেফর এবং তার ভাই আব্বাদকে পাহাড়ে আশ্রয় নিতে হয়। জেফর হযরত আবু বকর (রা.)-কে এই পুরো ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন এবং সাহায্য প্রার্থনা করেন। হযরত আবু বকর (রা.) তার কাছে দুজন আমীর প্রেরণ করেন। একজন হলেন হুযায়ফা বিন মেহসান গালফানী হিমিয়ারী যাকে ওমানের উদ্দেশ্যে এবং অপরজন হলেন আরফাযা বিন হারসামা বারকী ইয়াযদী যাকে মাহ্রা অভিমুখে প্রেরণ করে নির্দেশ দেন, তারা দুজন যেন একইসাথে সফর করেন আর যুদ্ধের সূচনা যেন ওমান থেকে করেন। মাহ্রা ইয়েমেনের একটি গোত্রের নাম ছিল। তিনি (রা.) সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, যখন ওমানে যুদ্ধ হবে তখন হুযায়ফা কমাণ্ডার হবে এবং মাহ্রাতে যখন যুদ্ধ হবে তখন হুযায়ফা সেনাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

হযরত হুযায়ফা (রা.) এবং হযরত আরফাযা (রা.)-এর পরিচয় হল, তবরীর ইতিহাসে হযরত হুযায়ফা (রা.)-এর নাম হুযায়ফা বিন মেহ্সান গালফানী উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে সাহাবীদের জীবনী সংক্রান্ত পুস্তকে তাঁর নাম হুযায়ফা কালআনী উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর মৃত্যুকাল পর্যন্ত ওমানের গভর্ণর ছিলেন।

সাহাবীদের জীবনী-সংক্রান্ত পুস্তকে হযরত আরফাযা (রা.)-এর পুরো নাম আরফাযা বিন হুযায়মা (রা.) বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা ইবনে আসীরের মতে তাঁর পিতার নাম হারসামা ছিল। তিনি শত্রুদের বিরুদ্ধে রণকৌশলের কারণে খ্যাতি রাখতেন।

হযরত আবু বকর (রা.) তাদের দুজনের সাহায্যের জন্য হযরত ইকরামা বিন আবু জাহল (রা.)-কে প্রেরণ করেন। এর আগে ইয়ামামার যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণে মুসায়লামা কায্যাবের বর্ণনা দেয়ার সময় এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আবু বকর (রা.) যখন হযরত ইকরামা (রা.)কে ধর্মত্যাগের ফিৎনা ও বিদ্রোহ দমন করার জন্য প্রেরণ করেন এবং শুরাহ্বিল বিন হাসানা (রা)কে তার সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেন তখন তিনি (রা.) ইকরামাকে আদেশ দিয়েছিলেন, শুরাহ্বিল পৌঁছার পূর্বে তিনি যেন আক্রমণ না করেন, কিন্তু তিনি অপেক্ষা না করেই আক্রমণ করে বসেন যার ফলে তাকে পরাজয় বরণ করতে হয়। এ কারণে হযরত আবু বকর (রা.) তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন আর তাকে ওমানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার নির্দেশ দেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর নির্দেশে ইকরামা (রা.) স্বীয় সৈন্যসামন্ত নিয়ে আরফাযা ও হুযায়ফা (রা.)-এর পেছনে ওমানের দিকে রওয়ানা হন এবং তাদের দুজনের ওমান পৌঁছানোর পূর্বেই ইকরামা (রা.) ওমানের নিকটবর্তী রিজাম নামক স্থানে তাদের উভয়ের সাথে সাক্ষাত করেন। এরপর তারা জেফর এবং তার ভাই আব্বাদের নিকট তাদের বার্তা প্রেরণ করেন।

ইতিহাসের কিছু পুস্তক, যেমন কামিল ইবনে আসীর-এ তার নাম এআয বর্ণিত হয়েছে। রিজাম ওমানের একটি দীর্ঘ পর্বত শ্রেণী।

যাহোক, মুসলমান সেনাবাহিনীর সর্দারদের বার্তা পেয়ে জেফর এবং আব্বাদ নিজ নিজ অবস্থানস্থল থেকে বেরিয়ে আসেন। মুরতাদের নবীর দাবির পর তারা আত্মগোপন করেছিলেন, কেননা সে সেনাবাহিনী গঠন করেছিল এবং তার শক্তি বেড়ে গিয়েছিল। যাহোক, তারা নিজ অবস্থানস্থল থেকে বেরিয়ে আসেন এবং সুহার নামক স্থানে এসে তাবু গাঁড়েন। আর হুযায়ফা, আরফাযা এবং ইকরামা (রা.)কে সংবাদ পাঠান, আপনারা সবাই আমাদের কছে চলে আসুন। সুহার, ওমানের পাহাড়ের সাথে লাগোয়া একটি গ্রাম। এ সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে, পাঁচ রাতের জন্য রজব মাসের শুরুতে ওমানের একটি বাজার বসত। অতএব মুসলমান সৈন্যবাহিনী সুহারে এসে একত্রিত হয় এবং আশেপাশের অঞ্চলকে মুরতাদমুক্ত করে ফেলে।

অপরদিকে লাকীদ বিন মালেক ইসলামী সেনাবাহিনী পৌঁছানোর সংবাদ পাওয়ার পর সে তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের প্রতিহত করতে বের হয় এবং দাবা নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে। সে মহিলা, শিশু এবং মালপত্র নিজের পিছনে রাখে যাতে এর মাধ্যমে রণক্ষেত্রে তার হাত দৃঢ় থাকে। 'দাবা'ও এ অঞ্চলের একটি শহর এবং বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। মুসলমান নেতৃবৃন্দ লাকীদের সাথে অন্যান্য সর্দারকেও পত্র লিখেন আর এর সূচনা করেন বনু জাযা য়েদ গোত্রের সর্দারের মাধ্যমে। এসব পত্রের উত্তরে সেই সর্দাররাও মুসলমান নেতৃবৃন্দকে পত্র দেয়। এই পত্র বিনিময়ের ফলাফল যা দাঁড়ায় তা হল, এই সর্দাররা সবাই লাকীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে মুসলমানদের সাথে এসে যোগ দেয়।

(উসদুল গাবাহ,৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২১-২২) (আল মুফাসসিল ফি তারিখিল আরাব কাবলুল ইসলাম, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৩৯) (সৈয়্যদনা হযরত আবু বাকার সিদ্দীক শখসীয়াত অউর কারনামে, প্রণেতা-সালাবী, পৃ: ৩৩৮) (মুজামুল বুলদান, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৭০, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ১৭০)

এই স্থানেই, অর্থাৎ দাবা নামক স্থানে লাকীদের সৈন্যবাহিনীর সাথেমুসলমানদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শুরুতে লাকীদের পাল্লা ভারী ছিল এবং মুসলমানদের পরাজয় অত্যাসন্ন ছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার নিজ কৃপাগুণে অনুগ্রহ করেন এবং এই কঠিন মুহূর্তে সাহায্য করেন। বাহরাইনের বিভিন্ন গোত্র এবং বনু আব্দুল কায়সের পক্ষ থেকে বিরাট সহায়ক সেনাদল এসে পৌঁছায়। ফলে তাদের শক্তি ও ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পায়, তাই তারা সামনে অগ্রসর হয়ে লাকীদের সৈন্যবাহিনীর ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ করে। এর ফলে লাকীদের সেনাবাহিনীর পা উপড়ে যায় এবং (যুদ্ধক্ষেত্র থেকে) পলায়ন করে। কিন্তু মুসলমানরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং ১০ হাজার যোদ্ধাকে হত্যা করে। মহিলা ও শিশুদের বন্দি করে, তাদের ধনসম্পদ ও বাণিজ্য কেন্দ্র দখল ক রে নেয় এবং এর এক-পঞ্চমাংশ আরফাজার হাতে হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। একইভাবে ওমানেও এই নৈরাজ্যের অবসান ঘটে এবং মুসলিম শাসন সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। যুদ্ধের পর হুযায়ফা (রা.) ওমানেই অবস্থান করেন এবং সেখানকার পরিবেশ পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ আর শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত হন। যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আরফাজা মালে গণিমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে মদিনা চলে যান। হযরত ইকরামা (রা.) তার সৈন্যদল নিয়ে মাহ্রার বিদ্রোহ নির্মূল করার জন্য যাত্রা ক রেন।

(সৈয়্যদনা হযরত আবু বাকার সিদ্দীক শখসীয়াত অউর কারনামে, প্রণেতা-সালাবী, পৃ: ৩৩৮-৩৩৯) (হযরত আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ২৪৪-২৪৫)

মুরতাদ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে হযরত ইকরামা (রা.)-এর অভিযান পরিচালনা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তা হল, হযরত আবু বকর (রা.) ইকরামাকে একটি পতাকা দিয়েছিলেন এবং তাকে মুসায়লামার মোকাবিলার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৭)

হযরত আবু বকর (রা.) মুসায়লামাকে প্রতিহত করার জন্য ইকরামাকে ইয়ামামার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন এবং তার পিছনে হযরত শুরাহ্বিল বিন হাসানা (রা.)-কেও ইয়ামামায় প্রেরণ করেছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাদের উভয়ের জন্য ইয়ামামার নাম উচ্চারণ করেন। অবশ্য ইকরামা (রা.)-কে বলেন, শুরাহ্বিল না পৌঁছা পর্যন্ত তুমি আক্রমণ করবে না। কিন্তু যেভাবে ইতোপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে ইকরামা (রা.) তাড়াহুড়ো করেন আর শুরাহ্বিল (রা.) আসার পূর্বেই তিনি (রা.) এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ করে বসেন। মুসায়লামা তাকে পিছু হটিয়ে দেয়, ফলে পরাজিত হয়ে তিনি পিছিয়ে যান। হযরত শুরাহ্বিল বিন হাসানা (রা.) যখন এ সংবাদ পান তখন তিনি যেখানে ছিলেন সেখানেই থেমে যান। হযরত আবু বকর (রা.) শুরাহ্বিল (রা.)-কে লিখেন, আমার পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তুমি ইয়ামামার নিকটেই অবস্থান কর।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৯১)

হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ইকরামা (রা.)-কে লিখেন, এখন আমি তোমার চেহারাও দেখতে চাই না আর তোমার কোন কথাও শুনতে চাই না যতক্ষণ না তুমি আমাকে কোন বিশেষ কাজ করে দেখাও। অসাধারণ কোন কাজ করে দেখাতে পারলে আমার কাছে আসবে। এরপর তিনি (রা.) তাকে বলেন, তুমি ওমান যাও এবং ওমানের অধিবাসীদের সাথে যুদ্ধ কর আর হুযায়ফা ও আরফাজা (রা.)-কে সাহায্য কর।

যাহোক, যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, ওমান পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের অংশ ছিল যার মাঝে সেই দিনগুলোতে বর্তমান সংযুক্ত আরব আমিরাত-এর পূর্বাঞ্চলও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখানে প্রতিমা পূজারী গোত্র আয্দ ও অন্যান্য গোত্রের বসতি ছিল যারা ছির অগ্নি উপাসক। মাসকাত, সোহার ও দাবা এই অঞ্চলের সমুদ্রতীরবর্তী শহর ছিল। তিনি এই নির্দেশও প্রদান করেছিলেন যে, তোমাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ অশ্বারোহী বাহিনীর সর্দার হবে, তথাপি যতদিন তোমরা হুযায়ফার অধীনস্থ অঞ্চলে অবস্থান করবে, তিনি তোমাদের সবার আমীর থাকবেন। সেখানে কার্যসম্পাদন শেষে তোমরা মাহ্রা চলে যেও। এরপর সেখান থেকে ইয়েমেন চলে যাবে এবং ইয়েমেন ও হাযার মওত-এর অভিযানে মুহাজের বিন আবু উমাইয়্যা'র সঙ্গ দেবে এবং ওমান ও ইয়েমেন-এ যারা মুরতাদ হয়েছে তাদেরকে দমন করবে। যুদ্ধে তোমার অর্জন সম্পর্কে যেন আমার কাছে সংবাদ পৌঁছতে থাকে।(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৯১)

হযরত আবু বকর (রা.) এসব নির্দেশ প্রদান ক রেন। যাহোক, হযরত আবু বকর (রা.)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী ইকরামার যাত্রারম্ভের পূর্বে হুযায়ফা বিন মিহসান গিলফানী ওমান আর আরফাযা বারকী মাহরা'র মুরতাদদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী ইকরামা নিজ সৈন্যবাহিনী নিয়ে আরফাযা ও হুযায়ফার পেছনে রওয়ানা হন আর তাদের উভয়ের ওমানে পৌঁছার পূর্বেই তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হন। এর পূর্বে হযরত আবু বকর (রা.) তাদের দুজনকে এই তাকিদপূর্ণ নির্দেশ প্রদান করেছিলেন যে, ওমানের কার্যসম্পাদনের পর তারা যেন ইকরামার মতামত অনুযায়ী কাজ করেন। তিনি চাইলে তাদেরকে সাথে নিতে পারেন অথবা ওমানে অবস্থান করার নির্দেশ প্রদান কর তে পারেন। যাহোক, এরপর যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, এই তিনজন আমীর যখন ওমান এর নিকটবর্তী রিজাম নামক স্থানে পরস্পর মিলিত হন তখন তারা জায়ফার এবং আব্বাদ এর কাছে নিজেদের বার্তাবাহক প্রেরণ করেন। আর অপরদিকে লাকীদ যখন তাদের সেনাবাহিনীর আগমনের সংবাদ পায় তখন সে নিজ দলের লোকদের একত্র করে এবং দাবা'তে এসে শিবির স্থাপন করে। জায়ফার ও আব্বাদও নিজ নিজ অবস্থানস্থল থেকে বের হন আর সোহার এসে শিবির স্থাপন করেন। হুযায়ফা, আরজাফা ও ইকরামাকে বলে পাঠান যে, আপনারা সবাই আমাদের কাছে চলে আসুন। অতএব যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে তারা সবাই এই দু'জনের কাছে সোহার-এ একত্রিত হন আর নিজেদের সংলগ্ন অঞ্চলসমূহ মুরতাদদের থেকে পবিত্র করেন। এক পর্যায়ে আশেপাশের সমস্ত লোকের সাথে তাদের সন্ধি হয়ে যায়। অধিকন্তু উক্ত আমীরগণ লাকীদ-এর সঙ্গী সর্দারদের পত্র লিখেন। তারা বনু জুদায়েদ-এর নেতার মাধ্যমে আরম্ভ করেন। পত্যুত্তরে সর্দাররাও মুসলমানদেরকে পত্র লিখে। যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, এর ফলে নেতারা লাকীদ থেকে পৃথক হয়ে যায়। এর পর লাকীদ এর সেনাবাহিনীর সাথে মুসলমানদের প্রচণ্ড লড়াই হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এ যুদ্ধের পর ইকরামা ও হুযায়ফা এ বিষয়ে একমত হন যে, হুযায়ফা ওমানেই অবস্থান করবেন এবং বিষয়াদি সামলাবেন ও মানুষের নিরাপত্তা বিধান করবেন, অপরদিকে হযরত ইকরামা মুসলমানদের বড় একটি বাহিনীর সাথে অন্যান্য মুশরিকদের মূলোৎপাটন করার জন্য সামনে এগিয়ে যান। তিনি মাহ্রা থেকে নিজের যুদ্ধের কার্যক্রম আরম্ভ করেন।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৯২)

হযরত ইকরামা'র মাহ্রা গোত্রের দিকে অগ্রাভিযানের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, আম্মানের মুরতাদদের দমনের পর ইকরামা নিজ সেনাবাহিনীর সাথে নাজাদ এলাকার মাহ্রা গোত্রের দিকে রওয়ানা হন। লেখা আছে যে, তিনি ওমানের জনগণ ও ওমানের আশেপাশের লোকদের কাছে তার এই অভিযানের জন্য সাহায্য চান। তিনি অগ্রসর হতে থাকেন, এমনকি মাহ্রা গোত্রের বসতিস্থলে পৌঁছে যান। তার সাথে বিভিন্ন গোত্রের মানুষ ছিল। এমনকি ইকরামা মাহ্রা গোত্র ও এর নিকটবর্তী এলাকায় চড়াও হন। তাকে প্রতিরোধ করার জন্য মাহ্রা গোত্রের লোকেরা দুই ভাগে ভাগ হয়ে ছিল। একটি দল জয়রূত নামক স্থানে শিখরীত নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে প্রতিরোধ গড়ে। দ্বিতীয় দল নাজাদ এ বনু মুহারেব এর এক ব্যক্তি মুসাব্বা-এর নেতৃত্বাধীন ছিল। প্রকৃতপক্ষে পুরো মাহ্রা গোত্র এই সেনাদলেরই নেতার অধীনে ছিল, শিখরীত ও তার দল ব্যতীত। এই দুই সর্দার একে অপরের বিরোধী ছিল এবং একে অপরকে নিজের দিকে আহবান করতো, আর এই উভয় সেনাদলের প্রত্যেকেই চাইতো যেন তার নেতাই সফলতা লাভ করে। এটাই সেই বিষয় ছিল যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের সাহায্য করেন এবং তাদেরকে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে দৃঢ় করেন আর শত্রুদেরকে দুর্বল করে দেন। ইকরামা যখন শিখরীত-এর অধীনে অল্প সংখ্যক লোক দেখেন তখন তিনি তাকে ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তনের আহবান জানান। অর্থাৎ তারা পূর্বে মুসলমান ছিল, তাদের বলেন পুনরায় মুসলমান হয়ে যাও আর এখন মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করো না। অতএব এই প্রাথমিক আহ্বানেই শিখরীত তার আহ্বান গ্রহণ

করে আর এভাবে আল্লাহ্ তা'লা মুসাব্বাকে দুর্বল করে দেন। এরপর ইকরামা মুসাব্বা'র দিকে বার্তাবাহক প্রেরণ করেন এবং তাকে ইসলামে প্রত্যাবর্তন এবং কুফর থেকে ফিরে আসার আহবান জানান। কিন্তু তার সাথে যে বিশাল সংখ্যক মানুষ ছিল সেইসংখ্যাধিক্য তাকে ধোঁকায় ফেলে দিল। শিখরীত-এর ইসলাম গ্রহণ করার কারণে মুসাব্বা ও শিখরীতের মাঝে দূরত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। যাহোক ইকরামা তার দিকে অগ্রসর হন এবং শিখরীতও তাঁর সাথে ছিল। নাজাদ-এ এই দু'জনের সাথে মুসাব্বা'র লড়াই হয় আর তারা এখানে দাবা থেকেও ভয়ংকর যুদ্ধ করে। আল্লাহ্ তা'লা মুরতাদ বি দ্রোহীদের পরাজিত করেন এবং তাদের নেতা নিহত হয়। মুসলমানরা পলায়নকারীদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং তাদের এক বড় সংখ্যক লোককে হত্যা করে আর বহু লোককে বন্দি করা হয়। আর গমিতের মাল তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে দুই হাজার সংখ্যক উন্নত জাতের উটনীও মুসলমানদের হস্তগত হয়। হযরত ইকরামা যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে পাঁচভাগে ভাগ করেন এবং শিখরীতকে 'খুমুস' এর সাথে হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে প্রেরণ করেন। অবশিষ্ট চার ভাগ তিনি মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দেন। এভাবে ইকরামার সৈন্যদল বাহন, ধনসম্পদ এবং যুদ্ধের সরঞ্জামাদির কারণে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠে। হযরত ইকরামা সেখানেই অবস্থান করে সেই অঞ্চলের সমস্ত লোকজনকে একত্রিত করেন আর তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। হযরত ইকরামা এই বিজয়ের সু-সংবাদ সায়েব নামক এক ব্যাক্তির মাধ্যমে হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে প্রেরণ করেন।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৯২-২৯৩)

এরপর হযরত ইকরামার ইয়েমেন অগ্রাভিযানের উল্লেখ রয়েছে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) তার পত্রে, যার উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে, হযরত ইকরামাকে নির্দেশনা প্রদান ক রেছিলেন যে, মাহরার পর ইয়েমেন চলে যাবে আর ইয়েমেন ও হাযার মওত-এর অভিযানে হযরত মুহাজের বিন আবু উমাইয়্যার সাথে থাকবে। আর ওমান ও ইয়েমেনে যারা মুরতাদ হয়েছে তাদেরকে দমন করবে। (তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৯১)

অতএব হযরত ইকরামা হযরত আবু বকরের এই নির্দেশনা পালনার্থে মাহরা থেকে বের হয়ে ইয়েমেন অভিমুখে যাত্রা করেন এবং আবিয়ানে গিয়ে পৌঁছেন। আবিয়ান হচ্ছে ইয়েমেনের একটি গ্রাম। তার সাথে অনেক বড় এক সৈন্যবাহিনী ছিল যাতে মাহ্রা গোত্র এবং অন্যান্য গোত্রের অনেক লোকজন অন্তর্ভুক্ত ছিল। হযরত ইকরামা তার পূর্ণ অবস্থান দক্ষিণ ইয়েমেনে (সীমাবদ্ধ) রাখেন এবং সেখানে নাখা ও হিমিয়ার গোত্রগুলোকে দমন করার কাজে ব্যস্ত থাকেন, আর (এতে) উত্তর ইয়েমেনে যাওয়ার কোন প্রয়োজনই পড়ে নি।

হযরত ইকরামা নাখা গোত্রের পলাতক লোকদের পাকড়াও করার পর সেই গোত্রের লোকদের একত্রিত করেন আর তাদের জিজ্ঞেস করেন যে, ইসলাম সম্পর্কে তোমাদের মতামত কী? তখন তারা বলে, অজ্ঞতার যুগেও আমরা ধর্মানুরাগী ছিলাম, ধর্মের প্রতি আমাদের ভালোবাসা ছিল। আমরা আরববাসীরা একে অপরের ওপর আক্রমণ করতাম না। তাই আমাদের তখন কী অবস্থা হবে যখন আমরা সেই ধর্মে প্রবেশ করব যার কল্যাণ সম্বন্ধে আমরা অবগত হয়েছি আর যার ভালোবাসা আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছে, অর্থাৎ ইসলামের প্রতি ভালোবাসা এখন আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছে। হযরত ইকরামা যখন তাদের সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন, তারা কি মন থেকেই এসব বলছে নাকি শুধুমাত্র জীবন বাঁচানোর জন্য বলছে। তিনি জানতে পারেন যে, বিষয়টি তেমনই যেমনটি তারা বর্ণনা করেছিল; তারা প্রকৃত অর্থেই সত্য কথা ব লেছিল। তাদের জনসাধারন রীতিমতো ইসলাম ধর্মে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকে, যদিও তাদের বিশেষ ব্যাক্তিবর্গের মাঝে যারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল তারা পলায়ন করে। এভাবে হযরত ইকরামা নাখা এবং হিমিয়ার গোত্রকে মুরতাদ হওয়ার অপবাদ থেকে মুক্ত ঘোষণা করেন আর তিনি তাদেরকে একত্রিত করার জন্য সেখানেই অবস্থান করেন।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৯৮) (হযরত সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা-মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, অনুবাদ-২৩৩) (মুজামুল বুলদান, ১ম খণ্ড, পৃ: ১০৯)

আবিয়ানে হযরত ইকরামার অবস্থানে আসওয়াদ আনসীর অবশিষ্ট দলের ওপর গভীর প্রভাব পড়ে, যার নেতৃত্ব দিচ্ছিল কায়েস বিন মাকশু এবং আমর বিন মা'দী কারেব। সানা থেকে পলায়ন করার পর কায়েস সানাতেই ঘুরাঘুরি করতে থাকে। আর আমর বিন মা'দী কারেব আসওয়াদ আনসীর লাহাজে অবস্থিত দলে যোগদান করেছিল। কিন্তু হযরত ইকরামা যখন আবিয়ানে পৌঁছেন তখন তারা উভয়েই, অর্থাৎ কায়েস ও আমর বিন মা'দী কারেব তাঁর সাথে যুদ্ধ করতে একত্রিত হয়, অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় । কিন্তু শীঘ্রই এই দুই জনের মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয় আর একজন অপরজন থেকে পৃথক হয়ে যায়। এভাবে হযরত ইকরামার পূর্ব দিক থেকে আগমন লাহাজে অবস্থিত মুরতাদদের দলকে নির্মূল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, শখসীয়্যত অউর কারনামে, প্রণেতা-সালাবী, পৃ: ৩০৪)

ইয়েমেনের পাশেই কিন্দা গোত্রের বসতি ছিল, যা হাযার মওত অঞ্চলে অবস্থিত। এই অঞ্চলের তত্বাবধায়ক ছিলেন হযরত যিয়াদ বিন লাবীদ (রা.)। তিনি যাকাতের বিষয়ে কঠোরতা প্রদর্শন করলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ হ য়ে যায়। হযরত ইকরামা এবং হযরত মুহাজের বিন আবু উমাইয়্যা উভয়েই তার সাহায্যের জন্য পৌঁছেন। এর বিস্তারিত বিবরণ হযরত মুহাজের বিন উমাইয়্যার বরাতে বর্ণনা করা হবে। যাহোক, হযরত ইকরামা যখন মুরতাদদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযান সম্পাদনের পর মদিনায় ফিরে আসার প্রস্তুতি আরম্ভ করেন তখন তার সফরসঙ্গী হিসেবে নোমান বিন জওনের কন্যাও ছিল যার সাথে তিনি যুদ্ধের ময়দানেই বিবাহ করেছিলেন। যদিও তিনি জানতেন যে, এর পূর্বে উম্মে তামীম ও মাজাআর কন্যাকে বিবাহ করার কারণে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর প্রতি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন (এবং এ বিষয়ে বিগত খুতবাগুলোতে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে) এতদসত্ত্বেও হযরত ইকরামা (রা.) তাকে বিবাহ করেন। এর ফলে হযরত ইকরামা (রা.)-এর সেনাদলের কয়েকজন সদস্য তার দল ত্যাগ করে। বিষয়টি মুহাজের (রা.)-এর কাছে উপস্থাপন করা হয় কিন্তু তিনিও মামলার কোনো নিষ্পত্তি করে দিতে পারেন নি আর এই সমস্ত বিষয় হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমীপে লিখে তাঁর সিদ্ধান্ত যাচনা করেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) পত্র মারফত জবাব দেন, ইকরামা বিবাহ করে কোনো অবৈধ কাজ করেন নি। তাদের মাঝে কতিপয় লোক এ বিষয়ে আশ্বস্ত হন কিন্তু কতক লোকের অসন্তুষ্টির কারণ হলো, কথিত আছে যে, নো'মান বিন জন একবার মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তার মেয়েকে বিবাহ করার অনুরোধ জানায় কিন্তু মহানবী (সা.) অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এবং তার মেয়েকে পিতার সাথে পাঠিয়ে দেন। মহানবী (সা.) যেহেতু উক্ত মেয়েকে বিবাহ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন তাই হযরত ইকরামা (রা.)-এর সেনাদলের একাংশের ধারণা ছিল যে, মহানবী (সা.)-এর অনুপম আদর্শের অনুসরণে হযরত ইকরামা (রা.)-এরও সেই মেয়েকে বিবাহ করা উচিত হয় নি। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) তাদের এই যুক্তি আমলে নেন নি। তিনি বলেন, তোমাদের অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং হযরত ইকরামা (রা.)-এর বিবাহকে বৈধ বলে আখ্যা দেন।

হযরত ইকরামা (রা.) সস্ত্রীক মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেনাদলের সেই অংশ যারা তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে দলছুট হয়েছিল, তারা পুনরায় এসে তার বাহিনীতে যোগ দেয়।

(হযরত সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, অনুবাদ- ২৪২-২৪৩)

আসমা বিনতে নো'মান বিন জন নামক যে মেয়ের বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় হল, হযরত ইকরামা (রা.) যে মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, বুখারী এবং অন্যান্য হাদীসের গ্রন্থে তার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। মহানবী (সা.)-এর সাথে সেই মেয়ের বিবাহ হয়েছিল এবং রুখসাতানার পূর্বেই তার এমন আচরণ প্রকাশ পায় যে, মহানবী(সা.) সেই মহিলাকে নিজ গোত্রে ফেরত পাঠিয়ে দেন। তার নাম এবং পুরো ঘটনাটি সম্পর্কে অনেক মতবিরোধ আছে। অনেকে তার বিবাহ হযরত মুহাজের বিন উমাইয়্যা বিন আবি উমাইয়্যার সাথে হয়েছিল বলে বর্ণনা করেছেন। যাইহোক এই ঘটনা বিস্তারিত উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বর্ণনা করেন: "যখন আরব বিজিত হয় এবং ইসলাম বিস্তার লাভ করতে থাকে তখন কিন্দা গোত্রের এক মহিলা যার নাম আসমা বা উমাইমা ছিল এবং আর সে জওনিয়া অথবা বিনতুল জওন নামেও প্রসিদ্ধ ছিল, তার ভাই লোকমান মহানবী (সা.)-এর নিজ জাতির পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে আগমন করে। সেসময় সে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিজ বোনের বিবাহ দেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে এবং তখনই মহানবী (সা.)-এর কাছে প্রস্তাবও দেয় যে, আমার এই ভগ্নির পূর্বে এক আত্মীয়ের সাথে বিবাহ হয়েছিল কিন্তু এখন সে বিধবা, সে খুব সুন্দরী এবং যোগ্যও বটে, অনুগ্রহপূর্বক আপনি তাকে বিবাহ করুন। মহানবী (সা.) যেহেতু আরবের গোত্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করতে চাইতেন তাই তার এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং বলেন, সাড়ে বারো আওকিয়া রূপা দেনমোহরে বিবাহ পড়ানো হোক। সে বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা সম্মানিত লোক, সে নিরিখে মোহরানা খুব সামান্য মনে হচ্ছে।

প্রত্যুত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, আমি আমার কোনো স্ত্রী বা মেয়ের জন্য এর অধিক মোহরানা ধার্য করি নি। যখন সে এতে সম্মতি প্রকাশ করে তখন বিবাহ পড়ানো হয় এবং সে মহানবী (সা.)-এর নিকট নিবেদন করে যে, আপনি কাউকে প্রেরণ করে আপনার স্ত্রীকে আনিয়ে নিন। মহানবী (সা.) আবু উসায়েদ (রা.)-কে এই কাজের দায়িত্ব দেন। আবু উসায়েদ সেখানে যান। জওনিয়া তাকে (রা.) নিজ ঘরে প্রবেশ করতে বলে। তখন হযরত আবু উসায়েদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর স্ত্রীদের জন্য পর্দার আদেশ অবতীর্ণ হয়েছে। তখন সে অন্য বিষয়ে জানতে চায় এবং তিনি (তথা হযরত আবু উসায়েদ) তাকে উত্তর দেন আর উটে

আরোহন করিয়ে তাকে মদীনায় নিয়ে আসেন এবং খেজুর গাছ পরিবেষ্টিত একটি স্থানে অবতরণ করান। তার আত্মীয়রা তার সাথে তার ধাত্রীকে পাঠিয়ে দেয়। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) লিখেছেন, যেরূপে আমাদের দেশেও ধনাঢ্য ব্যক্তিরা পারিবারিক কোন একজন চাকর বা ভৃত্য সাথে দিয়ে দেয় যেন মেয়ের কোন ধরনের কষ্ট না হয়। এই মহিলা যেহেতু সুন্দরী বলে খ্যাত ছিল আর এমনিতেও মহিলাদের নববধু দেখার আগ্রহ থাকে তাই মদীনার নারীরা তাকে দেখতে যায়। সেই মহিলার বর্ণনানুযায়ী কোন মহিলা তাকে শিখিয়ে দিয়েছিল যে, প্রথম দিন অর্থাৎ বাসর রাতেই প্রভাব বিস্তার করতে হয়। মহানবী (সা.) যখন তোমার কাছে আসবেন তখন বলে দিবে যে, আমি আপনার কবল থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই। ফলে তিনি তোমার প্রতি অধিক অনুরক্ত হয়ে যাবেন। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) লিখেছেন, যদি এই কথা সেই মহিলার অর্থাৎ যার বিয়ে ছিল, বানানো না হয়ে থাকে তাহলে এটি অসম্ভব নয় যে, কোন মুনাফিক তার স্ত্রী কিংবা তার অন্য কোনো আত্মীয়ের মাধ্যমে এমন দুষ্টোমি করে থাকবে অর্থাৎ এমন ধরনের কথা বলানো। মোটকথা মহানবী (সা.) যখন তার আগমনের সংবাদ পান তখন তিনি (সা.) তার জন্য নির্ধারিত কক্ষে প্রবেশ করেন। হাদীসে এ বিষয়ে যা লেখা আছে তার অনুবাদ হল, মহানবী (সা.) যখন তার নিকট আসেন তখন তিনি (সা.) তাকে বলেন, তুমি নিজেকে আমার কাছে সঁপে দাও। তখন সে জবাব দেয়, রাণী কি তার নিজ সত্তাকে সাধারণ মানুষের হাতে সঁপে দিতে পারে? নাউযুবিল্লাহ্, নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করেছে। আবু উসায়েদ (রা.) বলেন, তখন মহানবী (সা.) এই ধারণা করে যে, অপরিচিত হওয়ার কারণে সম্ভবত ভয় পেয়েছে, তাই তাকে সান্তনা দেয়ার জন্য তার শরীরে তিনি (সা.) হাত রাখেন। তিনি (সা.) তাঁর হাত রাখামাত্রই সে এই নোংরা ও অযৌক্তিক কথা বলে বসে যে, আমি আপনার থেকে আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যেহেতু একজন নবী খোদা তা'লার নাম শুনে পরম বিনয় প্রদর্শন করেন এবং তাঁর মাহাত্ম্যের প্রতি গভীর অনুরাগ রাখেন, তার এই কথা শুনে তিনি (সা.) তাৎক্ষণিক বলেন, তুমি অনেক বড় সত্তার দোহাই দিয়েছ এবং তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করেছ, যিনি সর্বোত্তম আশ্রয়দাতা; তাই আমি তোমার অনুরোধ গ্রহণ করছি। অতএব তিনি (সা.) তখনই বাইরে বের হয়ে আসেন এবং বলেন, হে আবু উসায়েদ! তাকে দুটি চাদর দিয়ে দাও এবং তার পরিবারের কাছে তাকে পৌঁছে দাও। অতএব এরপর তার মোহরের অংশ ছাড়াও অনুগ্রহস্বরূপ দুটি সুতির চাদরও দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন।

খুব উন্নত মানের সাদা লম্বা সুতি চাদর ছিল যেন পবিত্র কুরআনের নির্দেশ ***ওয়ালা তানসাউল ফাযলা বাইনাকুম***– বাস্তবায়িত হয়, যা এমনসব নারীদের সম্পর্কিত যাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দেওয়া হয়; আর তিনি (সা.) তাকে বিদায় করে দেন এবং আবু উসায়েদ (রা.) তাকে তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসেন। তার গোত্রের লোকদের নিকট এটি অত্যন্ত অসহনীয় ছিল এবং তারা তাকে তিরস্কার করে; কিন্তু সে এই উত্তরই প্রদান করতে থাকে যে, এটি আমার দুর্ভাগ্য আর সে এটিও বলেছে যে, আমাকে প্ররোচিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) যখন তোমার কাছে আসবেন তখন তুমি দূরে সরে যাবে এবং ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে। এভাবে তার ওপর তোমার প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হবে। জানা নেই, কারণ এটিই ছিল নাকি অন্য কিছু। যাহোক সে ঘৃণার বহির্প্রকাশ ঘটিয়েছিল এবং মহানবী (সা.) তার কাছ থেকে পৃথক হয়ে যান এবং তাকে তালাক দিয়ে দেন।

(তফসীরে কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৩৩-৫৩৫)

এক সাহাবীর স্মৃতিচারণে এটি আমি পূর্বেও বর্ণনা করেছি অর্থাৎ হযরত উসায়েদ (রা.)-এর স্মৃতিচারণে। যাহোক হযরত ইকরামা (রা.) কিন্দা, হাযারমাওত থেকে ইয়েমেন এবং মক্কার পথে ফেরত আসেন। যখন তিনি মদীনায় পৌঁছলেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে খালেদ বিন সাঈদ-এর সাহায্যের জন্য রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ প্রদান ক রেন। হযরত ইকরামা (রা.) তাঁর সাথে মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের ছুটি দিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাদের পরিবর্তে অপর একটি সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করেন একথা; এ কথা ভেবে তাদেরকে ছুটি দিয়ে দেন যে, এখন তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, অনেক বড় যুদ্ধাভিযান শেষ করে এসেছ। মোটকথা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) অপর এক বাহিনী প্রস্তুত করেন এবং তাদেরকে নির্দেশ প্রদান ক রেন, তারা যেন ইকরামা (রা.)'র পতাকা তলে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করে।

(সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, শখসীয়্যত অউর কারনামে, প্রণেতা- সালাবী, অনুবাদ, পৃ: ৪৩৩)

সেখানে হযরত ইকরামা (রা.) যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন এবং বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন- এর বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ্ সিরিয়া অভিযানের বিবরণে উপস্থাপন করা হবে।

এরপর পঞ্চম যে অভিযান ছিল, সেটি ছিল মুরতাদ ও বিদ্রোহী দের বিরুদ্ধে হযরত শুরাহ্‌বিল বিন হাসানার যুদ্ধাভিযান। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ইকরামাকে মুসায়লমার উদ্দেশ্যে ইয়ামামার অঞ্চলে প্রেরণ করেন এবং তাঁর সাহায্যার্থে হযরত শুরাহ্‌বিল বিন হাসানা কেও ইয়ামামার দিকে যেতে নির্দেশ দেন। হযরত শুরাহ্‌বিল বিন হাসানার সংক্ষিপ্ত পরিচয় হলো, তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ্ বিন মুতআ এবং তাঁর মাতার নাম ছিল হাসানা। কেউ কেউ তাঁকে কিন্দি আর কেউ কেউ তামিমী বলে অভিহিত করে। শুরাহ্‌বিলের পিতা তাঁর শৈশবকালেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আর তাঁর মাতা হাসানার নামানুসারেই তিনি শুরাহ্‌বিল বিন হাসানা নামে প্রসিদ্ধ হন। হযরত শুরাহ্‌বিল বিন হাসানা প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন ছিলেন। তিনি তার ভাইদের সাথে হাবশায় হিজরত করেছিলেন। আর যখন হাবশা থেকে ফিরে আসেন তখন তিনি মদীনায় বনু যুরায়েকের আবাসিক বাড়িতে অবস্থান করেন। খিলাফতের রাশেদার যুগে তিনি প্রসিদ্ধ সেনাপতিদের একজন ছিলেন। তিনি ১৮ হিজরীতে ৬৭ বছর বয়সে আমওয়াসের প্লেগে মৃত্যুবরণ করেন।

(উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬১৯-৬২০)

যাহোক, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত শুরাহ্‌বিল (রা.)'র পৌঁছানোর পূর্বে আক্রমণ করবে না- এই মর্মে হযরত আবু বকর (রা.)'র নির্দেশ সত্ত্বেও ইকরামা তাড়াহুড়ো করেন এবং হযরত শুরাহ্‌বিল আসার পূর্বেই মুসায়লামার ওপর আক্রমণ করে বসেন যাতে বিজয়মুকুট তাঁর মাথায় শোভা পায়। কিন্তু মুসায়লামা তাঁ কে পিছু হটিয়ে দেয় আর হযরত ইকরামা যখন এই ব্যর্থতার সংবাদ হযরত আবু বকর (রা.)-কে প্রেরণ করেন, তখন যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আবু বকর (রা.) তাকে ভৎসর্না করে একটি চিঠি লিখেন এবং বলেন, এই পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে মদীনায় ফিরে আসবে না, পাছে লোকদের মাঝে আবার হতাশা না ছেয়ে যায়। আর তাকে ওমান অভিমুখে যাবার নির্দেশ দেন। হযরত শুরাহ্‌বিল বিন হাসানা (রা.) পথিমধ্যেই হযরত ইকরামা (রা.)-এর পরাজিত হওয়ার সংবাদ পান। তিনি (রা.) অগ্রযাত্রা স্থগিত করে হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট পরবর্তী নির্দেশনা চেয়ে চিঠি প্রেরণ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে লিখে পাঠান, তুমি যেখানে আছো সেখানেই অবস্থান কর।

(হযরত আবু বাকার কে সরকারি খুতুত, প্রণেতা- খুরশিদ আহমদ ফারুক, পৃ:৪৩)

হযরত আবু বকর (রা.) শুরাহ্‌বিল (রা.)-কে লিখে পাঠান, আমার পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তুমি ইয়ামামার নিকটেই অবস্থান কর এবং যে ব্যক্তি অর্থাৎ মুসায়লামার সাথে যুদ্ধ করার জন্য তোমাকে প্রেরণ করেছি, আপাতত তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ো না। (তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৯১)

এরপর যখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদকে ইয়ামামার অভিযানের জন্য নিযুক্ত করেন তখন হযরত শুরাহ্‌বিল বিন হাসানাকে নির্দেশ দেন, যখন খালিদ বিন ওয়ালীদ তোমার সাথে এসে যুক্ত হবে এবং ইয়ামামার অভিযান সফলভাবে সমাপ্ত করবে তখন কুযা'আ গোত্রের অভিমুখে যাত্রা করবে এবং হযরত আমর বিন আ'স (রা.)-এর সাথে মিলিত হয়ে সেসব বিদ্রোহী কে দমন করবে যারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং এর বিরোধিতায় বদ্ধপরিকর। (হযরত আবু বাকার কে সরকারি খুতুত, প্রণেতা-খুরমিদ আহমদ ফারুক, পৃ: ২৪)

(হুযূর বলছেন,) শুধুমাত্র অস্বীকারই করেনি বরং বিরোধিতাও করেছে। কুযাআ' গোত্রও আরবের একটি বিখ্যাত গোত্র ছিল যারা মদীনা থেকে দশ মঞ্জীল দূরে 'কুরা' উপত্যকা পার হয়ে মাদায়েনে সালেহ্'র (অর্থাৎ সালেহ্'র শহরের) পশ্চিমে বসবাস করতো।(ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ২৩৭)

যাহোক, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র নির্দেশ অনুযায়ী হযরত শুরাহ্‌বীল তার সৈন্যবাহিনীসহ সেখানেই অবস্থান করেন, এরইমধ্যে মুসায়লামা তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাদের ওপর আক্রমণ করে বসে।

এই (ঘটনার) বিবরণ দিতে গিয়ে লেখক লিখেন,

হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ ইয়ামামার পথেই ছিলেন, তখন মুসায়লামার সৈন্যবাহিনী হযরত শুরাহ্‌বীলের সৈন্যবাহিনীর সাথে যুদ্ধ আরম্ভ করে এবং তাদেরকে পিছু হটিয়ে দেয়। কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেছেন, হযরত শুরাহ্‌বীল (রা.)-ও সেই একই ভুল করেছিলেন যা তাঁর পূর্বে প্রেরিত সেনাপতি হযরত ইকারামা করেছিলেন। অর্থাৎ, মুসায়লামার বিরুদ্ধে বিজয় মুকুট লাভ করার বাসনায় অগ্রসর হন কিন্তু তাকেও পরাজয় বরণ করে পিছু হটতে হয়েছিল। আসল ঘটনাটি এমন নয় বরং হযরত শুরাহ্‌বীল পাছে হযরত খালিদের সাথে মিলিত হয়ে তাদের ক্ষতি না করে বসেন- এই আশংকায় ইয়ামামার সৈন্যরা অর্থাৎ, মুসায়লামার বাহিনী আগ বাড়িয়ে মুসলিম বাহিনীর ওপর আক্রমণ করে বসে এবং তাদের পরাজিত করে পিছু হটাতে সফল হয়। এ দু'টোর মধ্যে কোন একটি ঘটে থাকবে, তবে ঘটনা হলো- হযরত শুরাহ্‌বীল তাঁর সেনাদল নিয়ে পিছু হটেন। যখন হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ তাদের কাছে পৌঁছেন এবং সকল পরিস্থিতি ও ঘটনা জানতে পারেন, তখন তিনি হযরত শুরাহ্‌বীলকে ভর্ৎসনা করেন। হযরত খালিদের অভিমত ছিল, 'যদি শত্রুর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার পুরো শক্তি না থাকে তাহলে কাঙ্খিত শক্তি লাভ না হওয়া পর্যন্ত অবশ্যই লড়াই এড়িয়ে যাওয়া উচিত'। শক্তি না থাকা সত্ত্বেও শত্রুর সাথে যুদ্ধ বাঁধানো উচিত নয় পাছে পরাজয় বরণ করতে হয়।

(হযরত সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, অনুবাদ, পৃ: ১৯, মুদ্রণে শিরকত প্রিন্ট প্রেস, লাহোর)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 21 July, 2022 Issue No. 29

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

যাহোক, পরবর্তীতে হযরত শুরাহ্‌বীল, হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদের সাথে যুদ্ধে অংশ নেন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ, হযরত শুরাহ্‌বীল কে 'মুকাদ্দামাতুল জায়েশ' বা অগ্রসেনার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। অর্থাৎ, তাকে সেনাবাহিনীর অগ্রভাগের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন; ডান দিকে যায়েদ বিন খাত্তাব (রা.) কে ও বাম দিকে আবু হুযায়ফা বিন উতবা বিন রবীআ কে নিযুক্ত করেন।

(সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, শখসীয়্যত অউর কারনামে, প্রণেতা- সালাবী, অনুবাদ, পৃ: ৩৫৫)

ইয়ামামার অভিযান সম্পন্ন হলে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র নির্দেশ অনুসা রে হযরত শুরাহ্‌বীল বনু কুযাআ'র বিদ্রোহী দের দমন করার জন্য হযরত আমর বিন আসের সাথে যোগ দেন।

অতএব, (ইতিহাসে) লেখা আছে, হযরত শুরাহ্‌বীল ও হযরত আমর বিন আ'স কুযাআ'র বিদ্রোহী মুরতাদদের ওপর আক্রমণ আরম্ভ করেন। হযরত আমর বিন আ'স সা'দ ও বালক্ গোত্রের ওপর আক্রমণ করেন এবং হযরত শুরাহ্‌বীল কালব্ গোত্র ও এর অধীনস্ত গোত্রগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করেন।(তারিখ ইবনে খুলদুন, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৪০)

ষষ্ঠ অভিযান ছিল বিদ্রোহী মুরতাদদের বিরুদ্ধে আমর বিন আসের যুদ্ধাভিযান। হযরত আবু বকর (রা.) একটি পতাকা হযরত আমর বিন আ'সকে প্রদান করেন এবং তাকে তিনটি গোত্র- কুযাআ', ওয়াদী'আ ও হারেস কে মোকাবিলা করতে যাবার নির্দেশ দেন।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৭)

কুযাআ'ও আরবের একটি প্রসিদ্ধ গোত্র- মদীনা থেকে দশ মঞ্জীল দূরত্বে ওয়াদিউল কুরা পার হয়ে সালেহ্ (আ.)-এর শহর (মাদায়েনের) পশ্চিমে যাদের বসবাস।(ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ২৩৭)

হযরত আমর বিন আ'স (রা.)'র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি হল, তার নাম আমর এবং ডাকনাম ছিল আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্, কিংবা কারও কারও মতে আবু মুহাম্মদ। তার পিতার নাম আ'স বিন ওয়ায়েল (এবং) তার মায়ের নাম ছিল নাবেগা বিনতে হারমালা। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে তার মায়ের আসল নাম ছিল সালমা, নাবেগা ছিল তার উপাধি। হযরত আমর বিন আ'স (রা.) ৮ম হিজরীতে মক্কা-বিজয়ের ছ'মাস পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবী (সা.) তাকে ৮ম হিজরীতে ওমানের গভর্নর নিযুক্ত করেন এবং তিনি মহানবী (সা.)-এর মৃত্যু পর্যন্ত এই পদেই বহাল থাকেন। এরপর তিনি সিরিয়ার বিভিন্ন বিজয়াভিযানে যোগ দেন এবং হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালে ফিলিস্তিনের শাসকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কর্মের মধ্যে একটি বিশেষ কীর্তি হল মিশর-বিজয়। মিশরবিজয়ের পর হযরত উমর (রা.) তাকে মিশরের শাসক নিযুক্ত করেন। হযরত উসমান (রা.)'র খিলাফতকালে তিনি মিশরের শাসকের দায়িত্ব থেকে অপসারিত হন এবং ফিলিস্তিনে নিভৃতজীবন বেছে নেন। আমীর মুয়াবিয়া তাকে পুনরায় মিশরের শাসক নিযুক্ত করেন এবং আমৃত্যু তিনি এই দায়িত্বে নিযুক্ত থাকেন। বলা হয়ে থাকে, তিনি ৪৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন; কতকের মতে ৪৭ হিজরীতে তার মৃত্যু হয়, কারও কারও মতে তিনি ৪৮ হিজরীতে মারা যান আবার কেউ কেউ বলে, ৫১ হিজরীতে (তার মৃত্যু) হয়েছে। কিন্তু সাধারণত ৪৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণের অভিমতটি সঠিক বলে গণ্য করা হয়।

(উসদুল গাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৩২-২৩৪)

হযরত আমর বিন আ'স (রা.) অত্যন্ত বাগ্মী ও সুবক্তা ছিলেন, অত্যন্ত বাকপটু ও বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি একাধারে একজন রাজনীতিবিদ ও সেনানায়ক ছিলেন। মহানবী (সা.) বিভিন্ন সেনা অভিযানে তার ওপর আস্থা রাখতেন। আমর বিন আ'স (রা.)'র পুত্র আব্দুল্লাহ্ ও স্ত্রী উম্মে আব্দুল্লাহ্‌র সমন্বয়ে গঠিত পরিবারটিকে সবচেয়ে উত্তম ও আদর্শ পরিবার আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

(এটলাস সীরাত নববী, পৃ: ৩৮৬)

জনৈক লেখক লিখেছেন, হযরত আবু বকর (রা.) যে এগারটি পতাকা তৈরি করিয়েছিলেন, সেগুলোর মধ্যে একটি পতাকা ছিল আমর বিন আসের জন্য।

তিনি (রা.) তাকে কুযাআ'র মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করার দায়িত্ব অর্পণ করেন, কেননা মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায়ও 'যাতুস্ সালাসীল' এর যুদ্ধে কুযাআ' গোত্রের সাথে লড়াই করেছিলেন। আর এই গোত্রের পুরো অবস্থা এবং তাদের সকল যাত্রাপথ সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন।

(ফাতিহ আযাম হযরত উমর বিন আল আস, প্রণেতা- মহম্মদ ফরজ মিসরী, অনুবাদ- পৃ: ১০৯)

মহানবী (সা.) ৮ম হিজরীর জিলহজ্ব মাসে হযরত আমর বিন আ'স (রা.)-কে ওমানের দুজন নেতা জুলন্দিয়াহ্‌র দু'পুত্র জায়ফর এবং আব্বাদ এর নিকট একটি তবলিগী পত্রসহ প্রেরণ করেছিলেন। এই কূটনৈতিক পদক্ষেপ পরম সাফল্য বয়ে আনে আর ওমানবাসী হযরত আমর বিন আ'স (রা.)'র হাতে ইসলাম গ্রহণ করে। মহানবী (সা.) সন্তোষ প্রকাশার্থে তাকে ওমানেই যাকাত সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত করেন। ওমানে অবস্থানকালেই হযরত আবু বকর (রা.)'র পত্র মারফত তিনি মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর সংবাদ পান। তাঁর (সা.)-এর মৃত্যুর পর আরবের অধিকাংশ গোত্র মুরতাদ হয়ে যায়। তাদের দমন করার লক্ষ্যে হযরত আবু বকর (রা.) হযরত আমর বিন আ'স (রা.)-কে ওমান থেকে ডেকে পাঠান, তিনি হযরত আবু বকর (রা.)'র নির্দেশ পালনার্থে ওমান থেকে মদীনায় চলে আসেন।

(সীরাত হযরত উমর বিন আল আস, প্রণেতা- ডাক্টর হাসান ইব্রাহিম হাসান, অনুবাদ- ৪৯-৫৩)

ধর্মত্যাগ ও বিদ্রো হের নৈরাজ্য দমনকল্পে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) যখন এগারোজন আমীর নিযুক্ত করেন তখন তিনি শুরাহ্‌বীল বিন হাসানাহ্'কে নির্দেশ প্রদান করেছিলেন যে, যখন তোমরা ভালোভাবে ইয়ামামার অভিযান শেষ করবে তখন কুযাআ' গোত্র অভিমুখে যাত্রা করবে আর হযরত আমর বিন আ'সের সাথে মিলিত হয়ে কুযাআ'র সেসব বিদ্রোহীকে দমন করবে যারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাবে এবং এর বিরোধিতার বদ্ধপরিকর থাকবে। (হযরত আবু বাকার কে সরকারি খুতুত, প্রণেতা- খুরশিদ আহমদ ফারুক, পৃ: ৪৩)

অতএব, হযরত আমর বিন আ'স ও হযরত শুরাহ্‌বীল উভয়ে সম্মিলিতভাবে কুযাআ' গোত্রের বিদ্রোহী দের বিরুদ্ধে কার্যক্রম শুরু করেন এবং তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ শুরু করেন। জনৈক লেখক এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে লিখেন,কুযাআ' গোত্র সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করেনি বরং অন্যান্য গোত্রের ন্যায় তারাও ভয় বা ধন-সম্পদের লোভে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তাদের হৃদয়ে ইসলামের প্রতি কোন ভালবাসা ছিল না। এ কারণেই মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর যখনই তারা মুসলমানদের দুর্বলতা আঁচ করতে পেরেছে তারা যাকাত প্রদা নে অস্বীকৃতি জানায়। খেলাফতের পক্ষ থেকে নির্দেশ পাওয়া মাত্রই আমর বিন আ'স (রা.) নিজ সৈন্যদের নিয়ে সেই পথেই জুযাম অভিমুখে রওয়ানা হন যেপথ দিয়ে পূর্বে গিয়েছিলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি কুযাআ' গোত্রকে যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত দেখতে পান। যুদ্ধ শুরু হয় ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। পূর্বের ন্যায় এবারও কুযাআ' গোত্রকে পরাজিত হতে হয় আর হযরত আমর বিন আ'স (রা.) তাদের কাছ থেকে যাকাত সংগ্রহ করেন এবং তাদেরকে পুনরায় ইসলামের ছত্রছায়ায় নিয়ে এসে বিজয়ীর বেশে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

(ফাতিহ আযাম হযরত উমর বিন আল আস, প্রণেতা- মহম্মদ ফরজ মিসরী, পৃ: ১০৯)

অবশিষ্ট অভিযানের উল্লেখ আগামীতে করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

সমাজের রীতি-নীতি ও কুপ্রথার বোঝা নিজেদের উপর চাপতে দিবেন না।

হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন:

সমাজের রীতি-নীতি ও কুপ্রথার বোঝা নিজেদের উপর চাপতে দিবেন না। আঁ হযরত (সা.) আমাদেরকে মুক্তি দিতে এসেছিলেন। আমরা সেই সব বিষয় থেকে মুক্তি পেয়েছি আর এই যুগের ইমাম হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে সেই অঙ্গীকারকে আরও দৃঢ় করেছি। যেমনটি বয়আতের ষষ্ঠ শর্তে উল্লেখ রয়েছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) লিখেছেন- কুপ্রথার অনুসরণ এবং রিপুর দাসত্ব থেকে বিরত থাকবে। অর্থাৎ চেষ্টা করতে হবে কুপ্রথা থেকে বিরত থাকার এবং রিপুর কামনা-বাসনা থেকে বিরত থাকার। অতএব, অল্পে তুষ্ট এবং কৃতজ্ঞ থাকার উপর গুরুত্ব দিন। এই শর্তটি ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেক আহমদীর জন্য। প্রত্যেক আহমদীকে নিজের সাধ্যানুসারে এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। "

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৫ শে নভেম্বর, ২০০৫)

(রিশতা নাতা বিভাগ, নাযারাত ইসলাহ ও ইরশাদ, কাদিয়ান)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir